সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি



সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি'র সূচিপত্র

সভাপতি মাও সেতুঙের লেখা ও বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত বিবৃতির একটি সংকলন হচ্ছে ছোট লাল বই বা সভাপতি মাও সে-তুঙের উদ্ধৃতি (ইংরেজি: Red Book বা Quotations from Chairman Mao Tse Tung)। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বহুল প্রচারিত এই বইটি বিশ্বের রাজনৈতিক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। লাল বইয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংস্করণটি ছিলো পকেট সাইজে ছোট আকারে ছাপানো সহজে বহনযোগ্য এবং অবশ্যই উজ্জ্বল লাল রঙে বাঁধাই করা। বইটি পাশ্চাত্য জগতে ছোট লাল বই নামে সাধারণভাবে পরিচিতি পায়। এটিকে বিবেচনা করা হয় ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছাপানো রাজনৈতিক বই হিসেবে।

মাও সেতুংয়ের উদ্ধৃতি যে কোনো কমিউনিস্ট কর্মীর জন্য এক আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্বের লড়াকু মানুষের কাছে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জনকারী এই ছোট্ট বইটি হয়ে আছে মুক্তির দিশারী এক অমর গ্রন্থ হিসেবে। বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, দাসপ্রথাসহ শোষণের বিরুদ্ধে সকল লড়াইয়ে এই গ্রন্থ জনগণকে দিয়েছে অবিরাম প্রেরণা।



দুই মহান শ্রমিক লাল বই দেখাচ্ছেন

লাল বইয়ের সূচিপত্র:

১১. জনসাধারণের লাইন

১২. রাজনৈতিক কাজ

১৩. অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক

১৪. সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক

১৫. তিনটা ব্যাপকতর গণতন্ত্র

১৬. শিক্ষা ও ট্রেনিং

১৭. জনগণের সেবা

১৮. দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

১৯. বিপ্লবী বীরত্ব

২০. অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন

২১. আত্মনির্ভরতা ও কঠোর সংগ্রাম

কমিউনিস্ট পার্টি

*** আমাদের কার্যের নেতৃত্বের কেন্দ্র শক্তি হচ্ছে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি।

আমাদের চিন্তাধারার পথনির্দেশের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চিনা জনগণের প্রজাতন্ত্রের প্রথম জাতীয় গণ- কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)

*** যদি বিপ্লব করতে হয়, তাহলে অবশ্যই একটা বিপ্লবি পার্টি থাকতে হবে। একটা বিপ্লবি পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী- লেনিনবাদি বিপ্লবি তত্ত্বে এবং বিপ্লবি রীতিতে গড়ে উঠা একটা বিপ্লবি পার্টি ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণি ও ব্যাপক জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহি কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্বদান করা অসম্ভব। সারা দুনিয়ার বিপ্লবি শক্তি এক হও, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো (নভেম্বর, ১৯৪৮)

*** চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টা ছাড়া, চীনা জনগণের প্রধান অবলম্বন হিসেবে চীনের কমিউনিস্টদের ছাড়া, চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তি অসম্ভব, চীনের শিল্পায়ত্তকরণ ও কৃষির আধুনিকীকরণও অসম্ভব। যুক্ত সরকার সম্পর্কে, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫

*** চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সমগ্র চীনের জনগণের নেতৃত্বের কেন্দ্র। এই কেন্দ্র ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কার্য বিজয়ী হতে পারে না। চীনের নয়া গণতান্ত্রিক যুব-লীগের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিদের সাক্ষাতদানকালে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ মে ১৯৫৭

*** সুশৃংখলিত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনসাধারনের সংগে সংযুক্ত একটা পার্টি; এমন একটা পার্টির নেতৃত্বাধীন একটা সৈন্যবাহিনী; এমন একটা পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলের একটা যুক্তফ্রন্ট — এই তিনটা হচ্ছে আমাদের শত্রুকে পরাজিত করার প্রধান অস্ত্র। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০ জুন, ১৯৪৯)

*** জনসাধারণের উপর অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, পার্টির উপর অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে; এ হচ্ছে দুটি মৌলিক নীতি।

যদি আমরা এ দুটি নীতিতে সন্দেহ করি, তাহলে কোনো কাজেই সম্পন্ন করতে পারবো না। কৃষি-সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চিন্তাধারায় সুসজ্জিত হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনা জনগণের কাছে এনে দিয়েছে একটা নতুন কর্মরীতি, তা প্রধানত তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোজনের রীতি, জনসাধারণের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের রীতি ও আত্মসমালোচনার রীতি। যুক্ত সরকার সম্পর্কে, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫

*** একটি মহান বিপ্লবি আন্দোলনের পথনির্দেশকারী রাজনৈতিক পার্টির কাছে যদি বিপ্লবী তত্ব না থাকে, ইতিহাসের জ্ঞান না থাকে এবং বাস্তব আন্দোলনের গভীর উপলব্ধি না থাকে, তাহলে তার পক্ষে বিজয়লাভ অসম্ভব। জাতীয় যুদ্ধে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** আমরা যেমন বলতাম, রীতির শুদ্ধিকরণ আন্দোলন হচ্ছে "মার্কসবাদী শিক্ষার একটা সর্বব্যাপী আন্দোলন"। রীতির শুদ্ধিকরণের অর্থই হলো সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সমগ্র পার্টির মার্কসবাদ অধ্যয়ন করা। রীতির শুদ্ধিকরণের মধ্যে আমরা নিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদকে আরো বেশি করে শিখে নিতে পারি। প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ ১৯৫৭

*** চীনের কয়েক শত মিলিয়ন জনসাধারণের উন্নততর জীবন সুনিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদ দেশটিকে একটি সুসমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও উচ্চমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে একটা দুরূহ কর্তব্য। রীতির শুদ্ধিকরণ আন্দোলন আমাদের চালাতে হয়, বর্তমানে চালাতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও চালাতে হবে এবং যা ভ্রান্ত তার থেকে অবিরামভাবে আমাদের মুক্ত রাখতে হবে, যাতে করে আমরা এই কর্তব্য আরো ভালোভাবে বহন করতে পারি এবং যারা সংস্কার সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও উচ্চ আদর্শে প্রবৃত্ত এমন সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত লোকদের সংগে উত্তমভাবে কাজ করতে সমর্থ হই। প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ ১৯৫৭

*** নীতি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির সমস্ত বাস্তব কার্যকলাপের প্রারম্ভিক বিন্দু এবং কার্যকলাপের প্রক্রিয়া ও পরিণতির মধ্য দিয়ে নিজকে প্রকাশ করে। একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির যে কোনো কার্যকলাপই হলো নীতি পালন করা। যদি সে নির্ভুল নীতি অনুসরণ না করে, তাহলে সে ভ্রান্ত

নীতি অনুসরণ করে; সচেতনভাবে কোনো নীতি অনুসরণ না করলে, সে অন্ধভাবে তা' অনুসরণ করছে। আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি, তা হচ্ছে নীতি অনুসরণের প্রক্রিয়া ও পরিণতি। কেবলমাত্র জনগণের অনুশীলনের মাধ্যমেই, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটা নীতি ভুল কি নির্ভুল তা' আমরা যাচাই করতে পারি এবং সেটা কতটা ভুল বা নির্ভুল তা' নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু মানুষের অনুশীলন, বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি ও বিপ্লবী জনসাধারণের অনুশীলন কোনো না কোনো নীতির সংগে জড়িত না হয়ে পারেই না। অতএব, কোনো কাজ করার আগে পার্টি সদস্যদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে বাস্তব অবস্থা অনুসারে রচিত নীতি অবশ্যই আমাদের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায়, পার্টি-সদস্যগণ ও জনসাধারণ আমাদের নীতির পরিচালনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধভাবে কাজ করবেন এবং ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করবেন। শিল্প-বাণিজ্যের নীতি সম্পর্কে, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮

*** আমাদের পার্টি যেমনি চীনা বিপ্লবের সাধারণ লাইন ও সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেছে, তেমনি বিভিন্ন বিশেষ কাজের লাইন ও বিশেষ নীতিও নির্ধারণ করেছে। কিন্তু অনেক কমরেড আমাদের পার্টির বিশেষ বিশেষ কাজের লাইন ও নীতিকে মনে রাখতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের পার্টির সাধারণ লাইন ও নীতিকে ভুলে যান। যদি প্রকৃতই আমরা পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ নীতি ভুলে যাই, তাহলে আমরা হবো অন্ধ, অসম্পূর্ণ ও অচেতন বিপ্লবী এবং বিশেষ কাজের লাইন ও বিশেষ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা হবো তখন দিশেহারা, কখনো ঝুঁকবো বাঁয়ে কখনো বা ডানে, ফলে আমাদের কাজের হবে ক্ষতি। শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১ এপ্রিল ১৯৪৮

*** নীতি এবং কৌশলই হচ্ছে পার্টির প্রাণ, সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের অবশ্যই এদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এবং হাজার কারণেও তাদের অমনোযোগি হওয়া উচিত নয়। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি (২০ মার্চ, ১৯৪৮)

শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম

*** শ্রেণি সংগ্রাম – কতকগুলো শ্রেণি জয়লাভ করে, আর কতকগুলো বা ধ্বংস হয়। এটাই ইতিহাস, এটাই হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এই দৃষ্টিকোণের বিপক্ষে দাঁড়ানোই হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদ। "ভ্রম ত্যাগ করো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও" (১৪ আগস্ট, ১৯৪৯)

*** শ্রেণি সমাজে, প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির সদস্য হিসেবে বাস করে, তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেক প্রকারের চিন্তাধারার উপর শ্রেণির ছাপ থাকে। অনুশীলন সম্পর্কে (জুলাই ১৯৩৭)

*** সমাজের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে প্রধানত সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বের বিকাশ, অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শ্রেণিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব; এই সব দ্বন্দ্বের বিকাশই সমাজকে সামনে ঠেলে দেয় এবং নতুনের দ্বারা পুরনো সমাজকে বদলাবার প্রেরণা দেয়। দ্বন্দ্ব সম্পর্কে, আগস্ট ১৯৩৭

*** কৃষকদের প্রতি জমিদারশ্রেণির নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন জমিদার শ্রেণির শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কৃষকদের বাধ্য করেছিলো। ... ... চিনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণিসংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক যুদ্ধই হলো ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালিকা-শক্তি। চিনা বিপ্লব ও চিনা কমিউনিস্ট পার্টি, ডিসেম্বর ১৯৩৯

*** চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামেরই একটা সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রই নিগ্রোদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা কোনো ক্রমেই শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবি বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য প্রগতি-ভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে গঠিত শ্বেতাঙ্গদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মার্কিনী নিগ্রোদের ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে বিবৃতি, ৮ আগস্ট, ১৯৬৩

*** জনগণকে সংগঠিত করাটা আমাদের উপর নির্ভর করে। চিনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের উৎখাত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করা

নির্ভর করে আমাদের উপর। প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল বস্তুই এক, তাকে আঘাত না করলে সে পড়বে না। এটা যেন ঝাড়ু দেবার মতো, ঝাড়ু না দিলে ধুলোও নিজ থেকে সরে যাবে না। জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি, ১৩ আগস্ট, ১৯৪৫

*** শত্রু নিজ থেকে বিলুপ্ত হবে না। কি চিনের প্রতিক্রিয়াশীলরা, কি চিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হামলাকারী শক্তি, কেউই আপন ইচ্ছায় ইতিহাসের মঞ্চ থেকে নেমে যাবে না। বিপ্লব শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাও (৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮)

*** বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়, বা প্রবন্ধ রচনা কিংবা চিত্র অংকন অথবা সূচিকর্মও এটা নয় । এটি এতো সুমার্জিত, এতো ধীর-স্থির ও সুশীল, এতো নম্র, এতো দয়ালু, বিনীত, সংযত ও উদার হতে পারে না ।বিপ্লব হচ্ছে একটি অভ্যুত্থান- উগ্রপন্থী প্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শোষিত শ্রেণি, অন্য শোষক শ্রেণিকে উৎখাত করে। হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট (মার্চ, ১৯২৭)

*** চিয়াং কাইশেক জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা ও লাভের প্রতিটি বিন্দু পর্যন্ত কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা? আমাদের নীতি হচ্ছে আঘাতের প্রতি আঘাত, প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়াই করা। আমরা চিয়াং কাইশেকের পদ্ধতি অনুসারে কাজ করি। চিয়াং কাইশেক সর্বদা জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা করে, তার বাম হাতে একটা অসি, ডান হাতে আর একটা। তার পদ্ধতি অনুসারে আমরাও অসি ধারন করি। ... ... এখন চিয়াং কাইশেক তার অসিতে ধার দিচ্ছে, অতএব, আমাদেরও অবশ্যই অসিতে শান দিতে হবে। জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি, ১৩ আগস্ট, ১৯৪৫

*** কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হলো বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন এত অল্প সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তখন কোনো বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবকে আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত করবো না এবং অবশ্যই সফল হবো, এ বিষয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বন্ধুদের ঐকবদ্ধ করতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের

বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে। "চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ" (মার্চ , ১৯২৬)

*** সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগসাজসে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলাতান্ত্রিক, বিদেশী পুঁজিবাদের দালাল শ্রেণি, বড় জমিদার শ্রেণি এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশই হলো আমাদের শত্রু। শিল্পীয় সর্বহারা শ্রেণিই আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্তি। সমস্ত আধা-সর্বহারা শ্রেণি এবং ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণি আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণির দক্ষিণপন্থিরা আমাদের শত্রু এবং বামপন্থিরা আমাদের মিত্র হতে পারে_ কিন্তু আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের ফ্রন্টের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করতে দেয়া উচিত নয়। "চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ" (মার্চ , ১৯২৬)

*** যে লোক বিপ্লবী জনগণের পক্ষে দাঁড়ায় সেই বিপ্লবী; যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের পক্ষে দাঁড়ায় সে প্রতিবিপ্লবী। যে লোক কেবল মুখে মুখেই বিপ্লবী জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়ায় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ, সে বুলিতেই বিপ্লবী। যে কেবল মুখে নয় বরং কাজেও বিপ্লবী জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়ায়, সে একজন পুরো বিপ্লবী। "চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ (২৩ জুন, ১৯৫০)

*** আমি মনে করি, আমাদের পক্ষে, একজন লোক, একটা পার্টি, একটা সৈন্যবাহিনী অথবা একটা বিদ্যালয় যদি না শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে এটা খারাপ, সেক্ষেত্রে এটা অর্থ করে যে, আমরা নিশ্চিতভাবে শত্রুর সম-অবস্থায় পড়ে আছি। যদি আমরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হই, তাহলে সেটা ভাল, এটা প্রমাণ করে যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে আমরা একটা স্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনেছি। যদি শত্রু আমাদের ক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে ও অত্যন্ত কদর্যভাবে চিত্রিত করে এবং বলে যে, আমাদের কোনো সদগুণ নেই, সেটা আরো উত্তম, সেটা প্রমাণ করে যে, আমরা কেবলমাত্র যে শত্রু ও আমাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানতে পেরেছি তাই নয় বরং আমাদের কাজেও বিরাট সাফল্য অর্জন করেছি। "শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল, খারাপ নয়" (২৬ মে, ১৯৩৯)

*** শত্রু যার বিরোধিতা করে আমাদের তা সমর্থন করা উচিত এবং শত্রু যা সমর্থন করে আমাদের তার বিরোধিতা করা উচিত। কেন্দ্রিয় সংবাদ-সংস্থা, সাও তাং পত্রিকা ও সিন মিন পত্রিকার তিনজন সংবাদদাতার সংগে সাক্ষাতকার (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

*** আমরা সর্বহারা শ্রেণি ও জনসাধারণের স্বপক্ষে দাঁড়াই। কমিউনিস্টদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে যে, পার্টির অবস্থান, পার্টির প্রকৃতি ও পার্টির নীতির স্বপক্ষে তাঁদের দাঁড়াতে হবে। সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ (মে ১৯৪২)

*** বন্দুকধারী শত্রু নিশ্চিহ্ন করার পরেও বন্দুকহীন শত্রু থাকবেই, তারা অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করবে এবং এই শত্রুদের আমাদের কোনো মতেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। যদি এখন আমরা এই সমস্যাকে এইভাবে পেশ না করি এবং এইভাবে উপলব্ধি না করি, তাহলে আমরা মস্ত বড় ভুল করবো। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের পরাজয়কে নিশ্চয়ই মেনে নেবে না, তারা সর্বশেষ মরণ-কামড় দেবে। দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের পরেও তারা নানা উপায়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করবে ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আবার চীনকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে অপচেষ্টা করবে। এটা অবশ্যম্ভাবী ও সন্দেহাতীত; আমাদের কোনো অবস্থাতেই নিজেদের সতর্কতাকে শিথিল করা উচিত নয়। চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

*** আমাদের দেশে, মালিকানা সম্বন্ধে বলতে গেলে, যদিও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মোটামুটিভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে, যদিও পূর্বের বিপ্লবকালীন বিরাটাকার প্রবল ঝড়ের মতো জনসাধারণের শ্রেণিসংগ্রাম মূলত শেষ হয়েছে, তবুও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার ও বিদেশী পুঁজিবাদের দালাল শ্রেণির অবশিষ্টাংশ এখনো বিদ্যমান, বুর্জোয়া শ্রেণিও বিদ্যমান, ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির পুনর্গঠন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনো শ্রেণিসংগ্রামের অবসান ঘটেনি। সর্বহারা শ্রেণি ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার শ্রেণিসংগ্রাম, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার শ্রেণিসংগ্রাম, মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণি ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার শ্রেণিসংগ্রাম দীর্ঘতর ও আঁকাবাঁকাভাবে অগ্রসর হবে, কখনো বা অত্যন্ত তীব্র হবে। সর্বহারা শ্রেণি নিজের বিশ্বদৃষ্টিকোণ অনুসারে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে চায়, বুর্জোয়া শ্রেণিও নিজের বিশ্বদৃষ্টিকোণ অনুসারে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে চায়। এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে কে জিতবে, কে হারবে, সে সমস্যার এখনো প্রকৃত মীমাংসা হয়নি। জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামে কে জিতবে, কে হারবে, সে সমস্যা মীমাংসা করতে এখনো বেশ দীর্ঘ সময় লাগবে। তার কারণ হচ্ছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণি এবং পুরনো সমাজ থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব আমাদের দেশে আরো দীর্ঘদিন থাকবে এবং শ্রেণিগত মতাদর্শ হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটা যদি যথেষ্ট উপলব্ধি করা না যায় অথবা আদৌ উপলব্ধি করা না যায়, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে এবং প্রয়োজনীয় মতাদর্শগত সংগ্রামকে উপেক্ষা করা হবে। জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমাদের দেশে বুর্জোয়া শ্রেণি ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তাধারা এবং মার্কসবাদবিরোধী চিন্তাধারা আরো দীর্ঘ সময় ধরে থাকবে। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত কায়েম হয়েছে। উৎপাদন উপকরণের মালিকানার রূপান্তরের ক্ষেত্রে মোটামুটি বিজয়লাভ করেছি, কিন্তু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ফ্রন্টে আমরা এখনো সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করিনি। সর্বহারা শ্রেণি ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে মতাদর্শের ক্ষেত্রে কে জিতবে, কে হারবে, সে প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা এখনো হয়নি। বুর্জোয়া শ্রেণি ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তাধারার বিরুদ্ধে এখনো আমাদের দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালাতে হবে। এটা বুঝতে না পারা এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম ত্যাগ করা ভুল। সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা, সমস্ত বিষাক্ত আগাছা, সমস্ত দৈত্য-দানবকে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই তাদের বাধাহীনভাবে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া উচিত না। কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, বিশ্লেষণাত্মক ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত এবং কখনো উগ্র, আমলাতন্ত্রবাদী, আধিবিদ্যক ও গোঁড়ামিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। প্রচারকার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** মতান্ধতাবাদ ও সংশোধনবাদ উভয়ই মার্কসবাদের পরিপন্থী। মার্কসবাদ অবশ্যই এগিয়ে যাবে, অনুশীলনের বিকাশের সংগে সংগে অবশ্যই বিকাশ লাভ করবে, এটা অচল থাকতে পারে না। নিশ্চল ও অপরিবর্তিত থাকলে এটা হয়ে পড়বে প্রাণহীন। কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক নীতিকে অবশ্যই লঙঘন করা চলবে না, অন্যথায়, ভুল করা হবে। আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ দিয়ে মার্কসবাদকে দেখা এবং এটাকে অনড়-অটল কিছু একটা বলে ভাবাই হচ্ছে মতান্ধতাবাদ। মার্কসবাদের মৌলিক নীতিকে অস্বীকার করা ও মার্কসবাদের সার্বিক সত্যকে অস্বীকার করাই হচ্ছে সংশোধনবাদ। সংশোধনবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তাধারাই একটা রূপ।

সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার পার্থক্য এবং সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব ও বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বের মধ্যকার পার্থক্যকে মুছে দেয়। তারা যার ওকালতি করে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক লাইন নয় বরং পুঁজিবাদের লাইন। বর্তমান অবস্থায়, মতান্ধতাবাদের চেয়ে সংশোধনবাদই বেশি অনিষ্টকর। মতাদর্শগত ফ্রন্টে আমাদের বর্তমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে সংশোধনবাদের সমালোচনা প্রসারিত করা। প্রচারকার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ, ১৯৫৭

*** সংশোধনবাদ বা দক্ষিণপন্থি সুবিধাবাদ হচ্ছে এক ধরনের বুর্জোয়া ভাবধারা, এটা মতান্ধতাবাদের চেয়ে আরো বেশি বিপদজনক। সংশোধনবাদী, দক্ষিণপন্থি সুবিধাবাদীরা মুখে মার্কসবাদ আওড়ায়, তারাও "মতান্ধতাবাদকে" আক্রমণ করে। কিন্তু আসলে তারা যার উপর আক্রমণ করছে, সেটাই হচ্ছে মার্কসবাদের সবচেয়ে মৌলিক বস্তু। তারা বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্ববাদের বিরোধিতা করে বা তা বিকৃত করে, তারা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধিতা করে বা তা দুর্বল করতে অপচেষ্টা করে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ও সমাজতান্ত্রিক গঠনের বিরোধিতা করে বা তা দুর্বল করার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক বিজয়ের পর সমাজে আরো এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তারা মতাদর্শসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণির সংগে লড়াই করে। এই সংগ্রামে সংশোধনবাদীরাই হচ্ছে তাদের প্রধান সহায়। জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

*** কমিউনিজম হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির একটা পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শের ব্যবস্থা এবং একই সময়ে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থাও। অন্য যে কোনো মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে এটা ভিন্ন, মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও যুক্তিসংগত। সামন্তবাদের মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ইতিহাসের যাদুঘরেরেই দ্রব্য হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাও পৃথিবীর এক অংশে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) যাদুঘরে স্থান নিয়েছে, অন্যান্য দেশেও এর অবস্থা হয়ে উঠেছে "পশ্চিম পাহাড়ে অস্তমিত সূর্যের ন্যায় দ্রুত ডুবন্ত, মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো" এবং শীঘ্রই যাদুঘরে এর স্থান হবে। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা যৌবন ও প্রাণ শক্তিতে উচ্ছল হয়ে পাহাড় উপড়ে ফেলে সাগর পাল্টে দেবার ও প্রচণ্ড বজ্রের শক্তিতে পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলছে। "নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" (জানুয়ারি ১৯৪০)

*** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবশেষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বদলাবেই, এটা হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা-মুক্ত বাস্তব নিয়ম। প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিহাসের রথচক্রের গতিরোধ করার জন্য যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, আগে বা পরে, বিপ্লব অবশ্যই ঘটবে এবং তা অনিবার্যভাবে বিজয় লাভ করবে। "মহান অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ নভেম্বর , ১৯৫৭)

*** আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের রাজনৈতিক অভিমত কখনো গোপন রাখি না। আমাদের ভবিষ্যতের কর্মসূচি হচ্ছে চীনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এবং কমিউনিস্ট সমাজে এগিয়ে নেওয়া, এটা নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত। আমাদের পার্টির নাম এবং আমাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিকোণ উভয়ই, ভবিষ্যতের এই সীমাহীন উজ্জ্বল ও চমৎকার সর্বোচ্চ আদর্শকে স্পষ্ট করে নির্দেশ করছে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের গোটা বিপ্লবী আন্দোলনটাই হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন, যার অন্তর্ভূক্ত দুটি পর্যায় – গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; এটা হলো দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, শুধুমাত্র প্রথম বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শেষ করেই

দ্বিতীয়টাকে সম্পন্ন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য গতি। তবু সমস্ত কমিউনিস্টদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজ চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। "চীনা বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" (ডিসেম্বর , ১৯৩৯)

*** সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন শক্তিকে মুক্ত করা। কৃষি ও হস্ত-শিল্পের ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানা ব্যবস্থায় এবং প্রাইভেট শিল্প বাণিজ্যের পুঁজিবাদী মালিকানা-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার ফলে উৎপাদন-শক্তি বিস্ময়করভাবে মুক্ত হতে বাধ্য। এই ভাবেই শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের বিস্ময়কর বিস্তৃতির জন্য সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। "সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (২৫ জানুয়ারি, ১৯৫৬)

*** আমরা এখন যে কেবল সমাজ ব্যবস্থায় প্রাইভেট মালিকানাকে পাবলিক মালিকানায় পরিণত করার বিপ্লব করছি তাই নয় বরং কারিগরি ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উৎপাদনকে বিরাটাকারের আধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদনে পরিবর্তনের বিপ্লব করছি, এ দুটি বিপ্লব পরস্পর সংযুক্ত। কৃষিক্ষেত্রে, আমাদের দেশের এই অবস্থায় প্রথমে সমবায়করণের প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজন, কেবলমাত্র তারপরেই বৃহদাকার যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব (পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কৃষিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিকাশ করা হয়)। অতএব, শিল্প ও কৃষি, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণ ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন, এ দুটি ব্যাপার আমাদের কোনো মতেই আলাদা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয় এবং কোনো কারণেই একটির উপরে গুরুত্ব আরোপ অপরটিকে দুর্বল করা উচিত নয়। "কৃষি-সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** নতুন সমাজ ব্যবস্থা সবেমাত্র কায়েম হয়েছে এবং তাকে সুসংবদ্ধ করার জন্য সময়ের দরকার। যে মুহূর্তে নতুন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই এটা সম্পূর্ণরূপে সুসংবদ্ধ হয়ে গেছে, এটা ধারণা করা উচিত নয়, এটা অসম্ভব। এটাকে ধাপে ধাপে সুসংবদ্ধ করতে হবে। এটাকে চূড়ান্তভাবে সুসংবদ্ধ করার জন্য অবশ্যই দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণ সাধন করতে হবে এবং অর্থনৈতিক ফ্রন্টের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অধ্যবসায়ী হতে হবে আর অবশ্যই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ফ্রন্টেও নিত্য শ্রমসাধ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম এবং

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাকে চালানো প্রয়োজন। এ ছাড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শর্তাবলীর সহযোগিতারও প্রয়োজন। প্রচারকার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ, ১৯৫৭

*** আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করার সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে কে জিতবে, কে হারবে, তা স্থির করার সংগ্রাম আরো দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময় নেবে। কিন্তু আমাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে, এই সমাজতন্ত্রের নয়া ব্যবস্থা অবশ্যই সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে। আমরা নিশ্চিতভাবে আধুনিক শিল্প, আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসহ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে পারি। প্রচারকার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ, ১৯৫৭

*** আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি যারা শত্রুভাবাপন্ন, সেই সব বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অতি অল্প। এ ধরনের লোক আমাদের এই সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে পছন্দ করে না, তারা পুরনো সমাজের জন্য উৎসুক। যখনই কোনো সুযোগ পাবে, তারা উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গের সৃষ্টি করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে উল্টে দিতে ও পুরনো চীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অপচেষ্টা করবে। সর্বহারা শ্রেণির ও বুর্জোয়া শ্রেণির দুটা পথের মধ্যে—একগুঁয়ের মতো এরা পরবর্তী পথকেই বেছে নেবে। আসলে এই পরবর্তী পথ বাস্তবায়িত করা অসম্ভব, তাই তারা প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। এই রূপ লোক রাজনৈতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে, শিল্প ও বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি এবং ধর্মীয়— সকল পরিবেষ্টনের মধ্যেই রয়েছে। তারা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। প্রচারকার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ মার্চ, ১৯৫৭

*** গুরুতর সমস্যাই হচ্ছে কৃষকদের শিক্ষাদান করা। কৃষকদের অর্থনীতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা অনুসারে বিচার করলে দেখা যায়, কৃষির সামাজিকীকরণের জন্য দীর্ঘ সময় এবং সযত্ন কাজের প্রয়োজন। কৃষির সামাজিকীকরণ ছাড়া পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ সমাজতন্ত্র হতে পারে না। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০ জুন, ১৯৪৯)

*** আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে: (১) ব্যাপক কৃষকসাধারণ পার্টির নেতৃত্বে ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক পথে আসতে ইচ্ছুক; (২) কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে এগিয়ে যাবার নেতৃত্বদানে পার্টি সক্ষম।

এই দুটি হচ্ছে বস্তুর সারাংশ ও প্রধান গতিধারা। "কৃষি-সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** সমবায় সমিতির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোর অবশ্যই এই সংস্থাগুলোতে বর্তমান গরীব কৃষক ও নতুন নিম্ন মাঝারি কৃষকদের প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে, পুরনো নিম্ন মাঝারি কৃষক এবং নতুন ও পুরনো উচ্চ মাঝারি কৃষককে সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে ধরা উচিত, কেবলমাত্র তাহলেই পার্টির নীতি অনুসারে গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে, সমবায় সমিতি সুসংবদ্ধ করা যেতে পারে, উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে, সঠিকভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্ন করা যেতে পারে। না হলে, গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর কার্যকরী হতে পারে না। "ছাংসা জেলার কাউশান থানার উথাং কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতির প্রাধান্য কীভাবে মাঝারি কৃষকদের হাত থেকে গরীব কৃষকদের হাতে গেল"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে অবশ্যই ঐকবদ্ধ হতে হবে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হওয়াটা ভুল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে কাদের উপর নির্ভর করে মাঝারি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করবে? নিশ্চয়ই গরীব কৃষকদের উপর। অতীতে জমিদারদের বিরদ্ধে সংগ্রাম এবং ভূমি সংস্কার করার সময় এমনি করা হয়েছিল, এখন ধনী কৃষক ও অন্যান্য পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার সময়েও এইভাবে কাজ করতে হবে। উভয় বিপ্লব-পর্যায়ের গোড়ার দিকেই মাঝারি কৃষকগণ দোটানায় ছিলেন। যখন তারা ঘটনা প্রবাহের সাধারণ ধারা স্পষ্টভাবে দেখতে পান এবং বিপ্লবের বিজয় আসন্ন হয়, শুধু তখনই তারা বিপ্লবের পক্ষে আসেন। গরীব কৃষকদের অবশ্যই মাঝারি কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে, যাতে করে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত বিপ্লবকে দিনে দিনে সম্প্রসারিত করা যায়। "ফুয়ান জেলায় মাঝারি কৃষক সমিতি' ও 'গরীব কৃষক সমবায় সমিতির ঘটনা থেকে শিক্ষা-এর ভূমিকালিপি" (১৯৫৫)

*** অবস্থাপন্ন কৃষকদের মধ্যে পুঁজিবাদী ঝোঁকটা গুরুতর। সমবায়করণ আন্দোলনে ও তার পরে দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক কাজ কিছুটা শিথিল হলেই পুঁজিবাদী ঝোঁক বন্যার মতো

ছড়িয়ে পড়বে। "পুঁজিবাদী ঝোকের বিরুদ্ধে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা উচিত-এর ভূমিকালিপি" (১৯৫৫)

*** গোড়া থেকেই কৃষির সমবায়করণ আন্দোলন একটা গুরুতর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই ধরনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে না গিয়ে কোনো সমবায় সমিতিই স্থাপন করা যায় না। পুরনো ব্যবস্থার বুনিয়াদে একটা আনকোরা নয়া সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগে, সে বুনিয়াদটাকে অবশ্যই ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অনিবার্যভাবেই পুরনো ব্যবস্থার প্রতিফলন করার পুরনো চিন্তাধারার অবশেষ জনগণের মনে দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকে, তারা সহজে সরে যেতে চায় না। সমবায় সমিতি স্থাপন করার পরেও এটাকে অবশ্যই আরও অনেক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, যাতে করে সে নিজেকে সুসংবদ্ধ করতে পারে। সুসংবদ্ধ করার পরেও যদি এটা শিথিল হয়, তাহলে ভেঙ্গে পড়তে পারে। "একটা গুরুতর শিক্ষা-এর ভূমিকালিপি" (১৯৫৫)

*** সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে গ্রামাঞ্চলের পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বত্রই নতুন ধনী কৃষক গজিয়ে উঠছে, বহু অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষক নিজেদেরকে ধনী কৃষকে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। পর্যাপ্ত উৎপাদন উপকরণ থাকায় বহু গরীব কৃষক এখনও পূর্বের মতো দারিদ্রের ভেতরে রয়েছেন, কেউ দেনাগ্রস্ত হয়েছেন, কেউ কেউ নিজের জমি বিক্রি করছেন, কেউ বা জমি বন্ধক দিচ্ছেন। যদি এই অবস্থাকে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই গ্রামাঞ্চলে এই দুই ধরনের বিপরীতমুখী ঝোঁক দিন দিন আরও তীব্রতর হয়ে উঠবে। যেসব কৃষকেরা ভূমি হারিয়েছেন ও যেসব কৃষকেরা দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন, তারা আমাদের উপর অভিযোগ করবেন যে, তাদেরকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করছি না এবং কষ্ট নিবারণের জন্য কোনো সাহায্য করছি না। পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এমন অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষকেরাও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন, কারণ আমরা যদি পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করতে চাই, তাহলে আমরা কখনও এই সব কৃষকদের দাবি পূরণ করতে পারবো না। এমন অবস্থায় শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী কি অব্যাহতভাবে সুসংবদ্ধ হতে পারে? স্পষ্টই না। এই সমস্যা শুধুমাত্র নতুন ভিত্তিতেই মীমাংসা করা যেতে পারে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণকে বাস্তবায়িত করার এবং ক্রমে ক্রমে হস্তশিল্প ও পুঁজিবাদী শিল্প বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সমগ্র কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করতে হবে,

অর্থাৎ সমবায়করণ কার্যকরী করা এবং গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা, যাতে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত জনগণ এক সঙ্গে অবস্থাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন। আমরা মনে করি, শুধু এভাবেই শ্রমিক কৃষকের মৈত্রী সুদৃঢ় করা যায়। "কৃষি সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** … সামগ্রিক পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে ৬০ কোটি মানুষের স্বার্থে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা। যখন আমরা পরিকল্পনা রচনা করি, কাজ করি কিংবা সমস্যার বিষয় চিন্তা করি, তখন চীন দেশে যে ৬০ কোটি মানুষ আছে—এ কথাটা সর্বদাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে এবং কোনোমতেই তা ভুলে গেলে চলবে না। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াও আমাদের ৬০ কোটি জনসংখ্যা হচ্ছে একটা নির্ণায়ক উপাদান। বেশি লোকের অর্থ বেশি বিচার-বিবেচনা, বেশি উৎসাহ, বেশি কর্মোদ্যম। জনসাধারণ আজ এত বেশি অনুপ্রাণিত, সংগ্রামে দৃঢ়-সংকল্প এবং সাহসে পরিপূর্ণ যে ইতিপূর্বে তা আর কখনও দেখা যায়নি। "একটা সমবায় সমিতির পরিচিতি" (১৫ এপ্রিল, ১৯৫৮)

*** অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়া চীনের ৬০ কোটি জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, দারিদ্র্য ও পশ্চাদগামীতা। এটা দেখতে খারাপ ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু আসলে ভাল। দারিদ্র্য পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, কর্মোদ্যম এবং বিপ্লবের প্রেরণা দেয়। কোনো একটা সাদা কাগজে—যার উপর কোনো দাগ নেই, সে কাগজে সবচেয়ে নতুন ও সুন্দর অক্ষর লেখা যায় এবং সবচেয়ে নতুন ও সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা যায়। ঐ

*** চীনা বিপ্লবের দেশব্যাপী জয়লাভ এবং ভূমি সমস্যার সমাধানের পরেও চীনে আরও দুই ধরনের মৌলিক দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকবে। প্রথমত দেশের ভেতরকার, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত বৈদেশিক, অর্থাৎ চীন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই কারণে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবার পর শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রক্ষমতা দুর্বল করলে চলবে না বরং আরও জোরদার করতে হবে। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** “আপনারা কি রাষ্ট্রক্ষমতা বিলোপ করতে চান?” হ্যা, আমরা চাই, কিন্তু এখন না, আমরা এখনও এটা করতে পারি না। কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদ এখনও বর্তমান, দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী এখনও বর্তমান এবং আমাদের দেশে শ্রেণি বিদ্যমান। জাতীয় প্রতিরক্ষাকে সুসংবদ্ধ করার জন্য এবং জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বর্তমান কর্তব্য হচ্ছে জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সুদৃঢ় করা —প্রধানত গণফৌজ, গণপুলিশ এবং গণআদালতকে শক্তিশালী করা। “জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে” (৩০ জুন, ১৯৪৯)

*** আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে ও শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রাষ্ট্র। এই একনায়কত্ব কিসের জন্য? এই একনায়কত্বের প্রথম ভূমিকা হচ্ছে দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি ও ব্যক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববিরোধী শোষকদের দমন করা এবং যারা সমাজতান্ত্রিক গঠনকে বানচাল করে তাদের দমন করা, অর্থাৎ দেশের ভেতরে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো কোনো প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেফতার করা, বিচার ও শাস্তি দান করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ করা—এ সকলই একনায়কত্বের আওতায় পড়ে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য চোর, ঠগ, খুনী, গৃহদাহকারী, গুণ্ডাচক্র ও গুরুতরভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা লঙঘনকারী অন্যান্য খারাপ ব্যক্তিদের উপরেও একইভাবে একনায়কত্বের শাসন চালানো প্রয়োজন। এই একনায়কত্বের দ্বিতীয় ভূমিকা হচ্ছে বহির্শত্রুদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা। এমন অবস্থা দেখা দিলে আমাদের ও বহির্শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে মীমাংসা করাই হচ্ছে একনায়কত্বের কর্তব্য। এই একনায়কত্বের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত জনগণকে রক্ষা করা, যাতে করে তারা শান্তিতে শ্রম করতে পারে এবং আমাদের দেশকে আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসহ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। “জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

*** জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের জন্য শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ এবং চূড়ান্তভাবে বিপ্লব চালাতে সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমগ্র বিপ্লবের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ

হয়, আর শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব থাকলেই বিপ্লব জয়লাভ করে। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০ জুন, ১৯৪৯)

*** জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি ও শহরের ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির মৈত্রী, মুখ্যত শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী, কারণ এ দুটি শ্রেণি চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। সাম্রাজ্যবাদ এবং কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের উল্টে দেবার জন্য এ দুটি শ্রেণিই হচ্ছে প্রধান শক্তি। নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়া, প্রধানত তাদের মৈত্রীর উপর নির্ভর করে। ঐ

*** শ্রেণী সংগ্রাম, উৎপাদন সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হচ্ছে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার তিনটা মহান বিপ্লবী আন্দোলন, এই তিনটা আন্দোলনই হচ্ছে স্থির নিশ্চয়তা যে, কমিউনিস্টরা আমলাতন্ত্রবাদ থেকে মুক্ত হবেন, সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামিবাদকে এড়িয়ে যাবেন এবং চিরদিন অজেয় থাকবেন; সর্বহারা শ্রেণি যে ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে কার্যকরী করতে সক্ষম হবেন—এই তিনটি আন্দোলন হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা। অন্যথায় যদি জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, খারাপ লোক ও দৈত্যদানবদের একত্রে বের হয়ে আসতে দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের কেডারগণ এ সবের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে শত্রুর সঙ্গে আমাদের নিজেদের পার্থক্য নির্ণয় না করে শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশ করেন, শত্রুর দ্বারা কলুষিত, বিভক্ত ও ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়েন এবং আমাদের কেডারদের বাইরে টেনে নেওয়া হয় অথবা শত্রু আমাদের মধ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় এবং শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকে শত্রুর নরম ও কঠোর ফন্দীর সামনে পড়েন—যদি এমনি হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই দেশব্যাপী প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে বেশি সময় লাগবে না, খুম কম হলেও কয়েকটা বছর বা দশ বছরের বেশি লাগবে, আর খুব বেশি হলে কয়েক দশক লাগবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি নিশ্চয়ই হয়ে পড়বে সংশোধনবাদী পার্টি, ফ্যাসিস্ট পার্টি, আর গোটা চীনের রঙ যাবে বদলে। "ক্রুশ্চেভের মেকি কমিউনিজম ও পৃথিবীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে থেকে উদ্‌ধৃত" (১৪ জুলাই, ১৯৬৪)

*** জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের দুটি পদ্ধতি। শত্রুর প্রতি এটা একনায়কত্বের পদ্ধতি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দরকার এটা তাদেরকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে দেয় না, জনগণের

সরকারের আইন মানতে, পরিশ্রম করতে বাধ্য করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদেরকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে। অপরপক্ষে, জনগণের প্রতি এটা কোনো বাধ্যবাধকতার পদ্ধতি নয় বরং গণতন্ত্রের পদ্ধতি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ অবশ্যই তাদেরকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে দেয় এবং তাদেরকে এটা বা ওটা করতে বাধ্য না করে বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং বুঝায়। "চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ" (২৩ জুন, ১৯৫০)

*** আরো দৃঢ় ভিত্তিতে চীনে সমাজতান্ত্রিক কার্যের দ্রুত বিকাশের জন্য চীনা জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা প্রাণবন্ত রীতির শুদ্ধিকরণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । এটা হচ্ছে শহরে ও গ্রামে পরিচালনাধীন ও স্বাধীন সর্বজনীন বিরাট বিতর্ক বিস্তৃত করা – সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথ দু'টি সম্পর্কে, রাষ্ট্রের মৌলিক ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে, পার্টি ও সরকারের কর্মীদের কর্মরীতি এবং জনগণের জীবনযাত্রার কল্যাণ প্রভৃতি প্রশ্ন সম্পর্কে তথ্য পেশ করে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলার পদ্ধতিতে বিতর্ক চালানো, যাতে করে জনগণের ভেতরকার যে সব বাস্তব দ্বন্দ্বের এখনই মীমাংসা করা প্রয়োজন, তা নির্ভুলভাবে সমাধান করা যায়। এটাই হচ্ছে জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশিক্ষার ও আত্ম-পুণর্গঠনের আন্দোলন। "মহান অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ নভেম্বর , ১৯৫৭)

*** মহান গঠন কার্য চালানোর জন্য আমাদের সামনে রয়েছে অত্যন্ত কঠিন কর্তব্য। যদিও আমাদের পার্টির সভ্যসংখ্যা এক কোটিরও বেশি তবুও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তারা খুবই কম। আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যে, বহু কাজেই পার্টি বহির্ভূত লোকদের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যদি জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে এবং পার্টিবহির্ভূত লোকদের সাথে সহযোগিতা করতে নিপুণ না হই, তাহলে ভাল করে কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। গোটা পার্টির ঐক্যকে দৃঢ় করাটা অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্ত জাতি, গণতান্ত্রিক শ্রেণি, গণতান্ত্রিক পার্টি ও জনগণের সংগঠনের ঐক্যকে অব্যাহতভাবে সুদৃঢ় করতে হবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টকে অব্যাহতভাবে সুসংবদ্ধ ও প্রসারিত করতে হবে, পার্টি ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর যে কোনোরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিব্যক্তি আমাদের কাজের যে কোনো অংশের ভেতর দেখা দিলে, আমরা অবশ্যই মনোযোগের সঙ্গে তা শুদ্ধ করে চলবো। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা

*** আমাদের সামনে দুই ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তা-ই হচ্ছে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটা দ্বন্দ্ব। জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব—এই দুটি ভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের প্রথমে অবশ্যই বুঝতে হবে ‘জনগণ’ বলতে কি বুঝায় এবং শত্রু’ বলতে কি বুঝায়।... বর্তমান পর্যায়ে, সমাজতন্ত্র গঠনের সময়ে যে সমস্ত শ্রেণিস্তর ও সমাজগোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য অনুমোদন করে, সমর্থন করে এবং তাতে যোগদান করে, তারাই জনগণের আওতায় পড়ে; যে সমস্ত সমাজ-শক্তি ও সমাজগোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিরোধ করে, সমাজতান্ত্রিক গঠনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয় এবং তা বানচাল করার কাজে লিপ্ত হয়, তারাই জনগণের শত্রু। *ঐ*

*** আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণির ভেতরকার দ্বন্দ্ব, কৃষক শ্রেণির ভেতরকার দ্বন্দ্ব, বুদ্ধিজীবীদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিক ও কৃষক এই দুটি শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিক শ্রেণি-অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির ভেতরকার দ্বন্দ্ব এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের জনগণের সরকার সত্যিকারভাবে জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের সেবা করে, তবুও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোনো না কোনো দ্বন্দ্ব আছে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রাষ্ট্রস্বার্থ, যৌথস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীকতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, পরিচালক ও পরিচালিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কোনো কোনো কর্মচারীর আমলাতন্ত্রবাদী রীতি ও জনসাধারণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই ধরনের দ্বন্দ্বও হচ্ছে জনগণের ভেতরকার একটা দ্বন্দ্ব। সাধারণভাবে

বলতে গেলে, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে জনগণের স্বার্থের মৌলিক একত্বের ভিত্তির উপর দ্বন্দ্ব। ঐ

*** আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে বৈরী দ্বন্দ্ব। জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, শ্রমজীবি জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বলতে গেলে, অবৈরী দ্বন্দ্ব; শোষিত শ্রেণি ও শোষক শ্রেণির মধ্যে বৈরী দিক ছাড়া অবৈরী দিকও রয়েছে। ঐ

*** আমাদের দেশের জনগণের রাজনৈতিক জীবনে আমাদের কথায় ও কাজে কেমন করে ভুল এবং নির্ভুলের পার্থক্য করা উচিত? আমরা মনে করি, আমাদের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে, আমাদের দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা অনুসারে এবং আমাদের দেশের রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলো কর্তৃক বারংবার বিঘোষিত অভিন্ন রাজনৈতিক অভিমত অনুসারে এই ধরনের মানদণ্ড মোটামুটি নিম্নরূপ :

(১) গোটা দেশের বিভিন্ন জাতির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করা উচিত, বিভক্ত করা নয়;

(২) সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে ও সমাজতান্ত্রিক গঠনে হিতকর হওয়া উচিত, ক্ষতিকর নয়;

(৩) জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করা উচিত, তাকে ক্ষতি বা দুর্বল করা নয়;

(৪) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করা উচিত, তাকে ক্ষতি বা দুর্বল করা নয়;

(৫) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করা উচিত, তাকে প্রত্যাখ্যান বা দুর্বল করা নয়;

(৬) সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক ঐক্যের এবং সারা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্যের পক্ষে হিতকর হওয়া উচিত, ক্ষতিকর নয়।

এই ছয়টি মানদণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক পথ ও পার্টির নেতৃত্ব। ঐ

*** প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সংগ্রামের সমস্যা। জনগণের ভেতরে কোনো কোনো লোক এই সমস্যাটা কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন। দুই ধরনের লোকের মতামত আমাদের থেকে ভিন্ন। দক্ষিণঝোঁকী চিন্তাধারার লোকেরা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না এবং শত্রুকে আমাদের নিজেদের লোক বলে ধরে নেন। ব্যাপক জনসাধারণ যাদের শত্রু বলে মনে করেন ঠিক তাদেরকে তারা বন্ধু বলে মনে করেন। বামঝোকী চিন্তাধারার লোকেরা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে এমন পরিমাণে অতিরঞ্জিত করে তোলেন যে, তারা জনগণের ভেতরকার কোনো কোনো দ্বন্দ্বকে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বলে ধরে নেন এবং কোনো কোনো লোক যারা আসলে প্রতিবিপ্লবী নন তাদেরকেও প্রতিবিপ্লবী হিসেবে ধরে নেন। এই দুটো মতই ভুল, এ দুয়ের কোনোটাই প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার সমস্যাটা সঠিকভাবে মীমাংসা করতে পারে না এবং আমাদের প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার কাজে নির্ভুল মূল্যায়নও করতে পারে না। ঐ

*** গুণগত বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলোকে কেবলমাত্র গুণগত বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারাই সমাধান করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সর্বহারা শ্রেণির ও বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যকার দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; উপনিবেশগুলোর ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব কৃষির যৌথকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা হয়, কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধনের দ্বারা মীমাংসা করা হয়।… বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি, যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ভিন্ন, তাই মীমাংসার পদ্ধতিও ভিন্ন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পূর্বেরটা হচ্ছে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য টানার ব্যাপার এবং পরেরটা হচ্ছে নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানার ব্যাপার। নিশ্চয়ই, আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার পার্থক্যও নির্ভুল ও ভুলের সমস্যা। উদাহরণ স্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ—এসব অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী ও আমাদের মধ্যে কে নির্ভুল, কে ভুল, এটাও হচ্ছে নির্ভুল ও ভুলের সমস্যা, কিন্তু জনগণের ভেতরকার নির্ভুল ও ভুলের সমস্যার প্রকৃতি থেকে এটা ভিন্ন ধরনের। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** যে কোনো মতাদর্শগত প্রকৃতির সমস্যার এবং জনগণের ভেতরকার বিতর্কমূলক সমস্যার মীমাংসায় কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, কেবলমাত্র আলোচনা, সমালোচনা, বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, বাধ্য করা ও চাপ দেয়ার পদ্ধতি নয়। ঐ

*** কার্যকরীভাবে উৎপাদন ও অধ্যয়ন করার জন্য এবং সুশৃঙ্খলভবে জীবনযাপন করার জন্য জনগণ দাবি করেন যে, তাদের নিজেদের সরকার এবং উৎপাদন পরিচালক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থাসমূহের পরিচালকরা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবিধ উপযুক্ত প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করুন। এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, এইরূপ প্রশাসনিক নির্দেশ ছাড়া সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক নির্দেশ এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব মীমাংসার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে জারীকৃত প্রশাসনিক নির্দেশের সাথে বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকতে হবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশের উপর নির্ভর করলে চলবে না। ঐ

*** বুর্জোয়া শ্রেণি ও ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির নিজস্ব ভাবাদর্শ অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। অনিবার্যভাবেই নানা উপায়ে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্নে তারা তাদের নিজেদেরকে একগুয়ের মতো প্রকাশ করবে। তাদেরকে প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হতে না দেওয়া অসম্ভব। দমনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদেরকে নিজেদের প্রকাশ করতে না দেওয়া আমাদের উচিত নয় বরং তাদের তা করতে দেওয়া উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে বিতর্ক করা ও তাদের যথাযোগ্য সমালোচনা করা উচিত। নিঃসন্দেহে, আমরা

নানা প্রকারের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে অবশ্যই সমালোচনা করবো। সমালোচনা না করা ও সর্বত্র ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়তে দেখাটা এবং অবাধে তাদের বাজার দখল করতে দেওয়াটা নিশ্চয়ই চলবে না। ভুল থাকলে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে, বিষাক্ত আগাছা থাকলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা গোঁড়ামিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়, তাতে আধিবিদ্যক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয় বরং দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি। ঐ

*** জনগণের ত্রুটির সমালোচনা করা প্রয়োজন,... কিন্তু তা করতে গিয়ে অবশ্যই সত্যি সত্যি জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, এবং তাদেরকে রক্ষা এবং শিক্ষিত করার জন্য প্রাণঢালা আগ্রহের সাথে কথা বলতে হবে। কমরেডদের সঙ্গে শত্রুদের মতো ব্যবহার করার অর্থ শত্রুদের পক্ষে দাঁড়ানো। "সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

*** দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও স্থায়ী। কিন্তু দ্বন্দ্বের মীমাংসা পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ, দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিভিন্নতার জন্য ভিন্নতর হয়। কোনো কোনো দ্বন্দ্বে রয়েছে প্রকাশ্য বৈরীতা, অন্যগুলোতে নয়। বস্তুর নির্দিষ্ট বিকাশানুসারে কোনো কোনো দ্বন্দ্ব যা শুরুতে অবৈর কিন্তু পরে বৈর দ্বন্দ্বে বিকশিত হয়; আবার কোনো কোনো দ্বন্দ্ব যা শুরুতে বৈর পরে অবৈর দ্বন্দ্বে বিকাশ লাভ করে। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** সাধারণ অবস্থায়, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব বৈর নয়। কিন্তু তা যদি যথাযথভাবে মীমাংসিত না হয় অথবা আমরা যদি সজাগ না হই কিংবা সম্পূর্ণ অমনোযোগী হই, তাহলে বৈরীতার উদ্ভব হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের অবস্থা সাধারণত কেবলমাত্র আংশিক এবং অস্থায়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং জনগণের স্বার্থও মূলত এক। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণির ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে যে শ্রেণিসংগ্রাম চলছে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, তা হচ্ছে জনগণের ভেতরকার শ্রেণিসংগ্রাম, এর কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বৈতচরিত্র। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে তাদের চরিত্রে একটা বিপ্লবী দিক ছিল এবং একটা আপোসমূলক দিকও ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে তাদের চরিত্রের একটা দিক হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে মুনাফা অর্জন করা, অপর দিকে শাসনতন্ত্রের সমর্থন ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর গ্রহণ করার ইচ্ছাও আছে। সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার শ্রেণি ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি থেকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ভিন্ন। শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে শোষক ও শোষিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, স্বভাবতই এটা বৈর দ্বন্দ্ব। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় যদি এই দুই শ্রেণির বৈর দ্বন্দ্ব যথাযথভাবে মীমাংসিত হয়, তাহলে অবৈর দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা সম্ভব। যদি আমরা এটা যথাযথভাবে মীমাংসা না করি এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐক্য, সমালোচনা ও শিক্ষাদানের নীতি অবলম্বন না করি অথবা যদি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি আমাদের এই নীতিটা গ্রহণ না করে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্বটা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিবর্তিত হবে। ঐ

*** সমাজতান্ত্রিক দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশে জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রকে হাসিল করার উদ্দেশ্যে অনৈক্যের ও মতভেদের উস্কানি দেয় এবং উচ্ছল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। হাঙ্গেরীর ঘটনার এই শিক্ষার প্রতি সকলের নজর দেওয়া উচিত। ঐ

যুদ্ধ ও শান্তি

*** শ্রেণি ও শ্রেণির মধ্যে, জাতি ও জাতির মধ্যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠে, তখন সে দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার জন্য সংগ্রামের উচ্চতম রূপই হচ্ছে যুদ্ধ – যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভব থেকেই আরম্ভ হয়েছে। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** "যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ", এই অর্থে যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এমন একটা যুদ্ধও ঘটেনি, যার কোনো রাজনৈতিক প্রকৃতি ছিলো না। … …

কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে এবং এ অর্থে যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারবাহিক রূপ"। রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে এবং আগের মতো আর এগুতে পারে না, তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে ঝেড়ে দূর করার জন্য। … … বাধা যখন দূর হয় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন অর্জিত হয়, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাধা পুরোপুরিভাবে দূর না হলে, যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতেই হবে, যাতে পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জিত হয়। … … অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** ইতিহাসে যুদ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত, একটা ন্যায় যুদ্ধ আর একটা অন্যায় যুদ্ধ। যেসব যুদ্ধ প্রগতিশীল সেসবই ন্যায় যুদ্ধ, আর যেসব যুদ্ধ প্রগতিতে বাধা দেয় সে সবই হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। প্রগতিকে ব্যাহত করে যে সব অন্যায় যুদ্ধ, আমরা কমিউনিস্টরা সে সবেরই বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমরা কমিউনিস্টরা, শুধু যে ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না তাই নয় বরং সে সব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও করে থাকি। অন্যায় যুদ্ধ, ধরা যাক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দু'পক্ষই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের খাতিরে এ যুদ্ধে লড়লো, তাই সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতা করার পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ বেধে উঠার আগেই তাকে বাধাদান করতে যথাসাধ্য চেষ্টা

করা; যুদ্ধ বেধে উঠার পর যথাসম্ভব যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করা, ন্যায় যুদ্ধ দিয়ে অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা। ঐ

*** শ্রেণি সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য, তাঁদের বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণিকে উৎখাত করা অসম্ভব, অতএব, জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে", আগস্ট ১৯৩৭

*** বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিষ-প্রতিষেধক, এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয় বরং আমাদের নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি ন্যায় বিপ্লবী যুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং বহু বস্তুকে রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের রূপান্তরের পথ খুলে দিতে পারে। চীন জাপান যুদ্ধ, চীন জাপান উভয় দেশকেই রূপান্তরিত করবে; প্রতিরোধ যুদ্ধে এবং যুক্ত ফ্রন্টে চীন যদি অধ্যবসায়ের লেগে থাকে, তাহলে পুরানো জাপান নিশ্চয় এক নতুন জাপানে এবং পুরানো চীন এক নতুন চীনে পরিণত হবে; আর চীন জাপান উভয় দেশের লোক এবং বস্তু সব কিছুই এই যুদ্ধের মধ্যে ও এই যুদ্ধের পরে রূপান্তরিত হবে। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে", মে ১৯৩৮

*** প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এ সত্য বুঝতে হবে: "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে"। "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" (৬ নভেম্বর, ১৯৩৮)

*** বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও উচ্চতম রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই ঠিক, তা চীন দেশেই হোক বা বিদেশেই হোক, সর্বত্রই ঠিক। ঐ

*** চীন দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সর্বহারা শ্রেণি, জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি কেউই স্থান পাবে না এবং বিপ্লবে জয়লাভ করাও সম্ভব হবে না। আঠারো বছর ধরে আমাদের পার্টির বিকাশ, সুসংবদ্ধতা ও বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চলেছে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আজকের কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারতো না। রক্তের বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি, গোটা পার্টির কমরেডগণ অবশ্যই তা কখনও ভুলবেন না। "কমিউনিস্ট পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে" (৪ অক্টোবর, ১৯৩৯)

*** রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে চান এবং এটাকে বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে কেউ কেউ আমাদেরকে "যুদ্ধের সর্বশক্তিমান তত্ত্বের" প্রবক্তা বলে বিদ্রুপ করে। হ্যাঁ, আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের সর্বশক্তিমান তত্ত্বের প্রবক্তা। এটা খারাপ নয়, ভালোই; এটা মার্কসবাদী নিয়ম। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুকের নলই একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করবো। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে: শুধুমাত্র বন্দুকের শক্তিতেই শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণ সশস্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারেন; এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র বন্দুকের নল দিয়েই সমগ্র দুনিয়াকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" (৬ নভেম্বর , ১৯৩৮)

*** যুদ্ধ বিলোপ করার আমরা সমর্থক, আমরা যুদ্ধ চাই না; কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ বিলোপ করা যায় এবং বন্দুক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন। ঐ

*** যুদ্ধ মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যার এই দানব, মানব সমাজের অগ্রগতি অবশেষে তাকে ধ্বংস করবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা করবে। কিন্তু তাকে ধ্বংস করার কেবল একটিমাত্র পদ্ধতি আছে, তা হচ্ছে যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং শ্রেণির বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা শ্রেণির প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা।... মানব সমাজ যখন এমন একটা স্তরে এগিয়ে যাবে যেখানে শ্রেণির ও রাষ্ট্রের লোপ পাবে, তখন আর কোনো যুদ্ধ থাকবে না, প্রতিবিপ্লবী বা বিপ্লবী, অন্যায় বা ন্যায়, কোনো যুদ্ধই থাকবে না; মানবজাতির পক্ষে সেটা হবে অনন্ত শান্তির যুগ। বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের গবেষণার প্রেরণা এসেছে সমস্ত যুদ্ধের অবসান করার ইচ্ছা থেকে, এটাই হচ্ছে আমাদের কমিউনিস্টদের ও সমস্ত শোষক শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সীমারেখা। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** আমদের দেশ এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ শান্তি চায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনগণও তাই চান। যুদ্ধের জন্য লালায়িত এবং শান্তি চায় না

কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক সাম্রাজ্যবাদি দেশের কতকগুলো একচেটে পুঁজিপতি-চক্র, যারা মুনাফার জন্য আক্রমণের উপর নির্ভর করে। "চিনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

*** দুনিয়ার দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভ্রাতৃসুলভ দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের মৈত্রী ও সহযোগিতা আরও প্রসারিত করতে হবে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। আমাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায় এইরূপ সমস্ত দেশের সঙ্গে ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক মর্যাদা দানের এবং সমানাধিকার ও পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে স্বাভাবিক কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এবং দুনিয়ার সকল দেশের শান্তি আন্দোলন ও ন্যায় সংগ্রামের প্রতি আমাদের অবশ্যই সক্রিয় সমর্থন দিতে হবে। ঐ

*** সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কথা বলতে গেলেও, আমাদের সেখানকার জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সেই দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করতে হবে, কিছু ব্যবসা করতে হবে, সম্ভাব্য যে কোনো যুদ্ধকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু কোনো মতেই তাদের সম্পর্কে কোনোরূপ অবাস্তব ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমরা শান্তি কামনা করি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যদি যুদ্ধ করতে জেদ করে, তাহলে আমরা অটল সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ শেষ করেই গঠনকার্য আরম্ভ করবো, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রতিদিন যুদ্ধের ভয় করতে থাকলে, যুদ্ধ এসে গেলে আপনার উপায় হবে কি? প্রথমে আমি বলেছিলাম, পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে, যুদ্ধ বাধবে না, এখন আমি যুদ্ধ বাধার পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাগুলো জুড়ে দিয়েছি। এই দুধরনের সম্ভাবনা সবই বিবেচনা করা হয়েছে। "বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১৮ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** দুনিয়ার সকল দেশের লোক এখন আলোচনা করছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে কি না। এ প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হবে, বিশ্লেষণও করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা যদি যুদ্ধ বাধাবার জেদ ধরে, তবুও আমাদের

ভয় পাওয়া উচিত নয়। যে কোনো 'বিশৃঙ্খলা' সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব, এ প্রশ্ন সম্পর্কেও আমাদের সেই একই মনোভাব: এক, আমরা এর বিরুদ্ধে; দুই, আমরা একে ভয় করি না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরেই জন্মলাভ করেছিল দুই শ' মিলিয়ন মানুষের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ৯ শ' মিলিয়ন জনসংখ্যার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যদি সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে জেদ ধরে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, আরো কয়েক শত মিলিয়ন লোক সমাজতন্ত্রের পথে আসবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য পৃথিবীতে আর বেশি স্থান অবশিষ্ট থাকবে না, এটাও সম্ভব যে, গোটা সাম্রাজ্যবাদের ব্যবস্থাটাই পুরোপুরি ধ্বসে পড়বে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে", ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭

*** গোলযোগের সৃষ্টি করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার গোলযোগের সৃষ্টি করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, সর্বনাশের আগ পর্যন্ত_ এটাই হচ্ছে জনগণের কার্যের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের এবং বিশ্বের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের যুক্তি এবং কোনো দিনই তারা এ যুক্তি লঙঘন করবে না। এটাই হচ্ছে একটা মার্কসবাদী নিয়ম। যখন আমরা বলি, "সাম্রাজ্যবাদ খুবই হিংস্র" তখন আমরা অর্থ করি যে, ওদের স্বভাব কখনো বদলাবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজদের ধ্বংস অবধি তাদের কসাইয়ের ছুরি কখনো ছাড়বে না, কখনো তারা বুদ্ধদেব হবে না।

সংগ্রাম করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, বিজয় অবধি_ এটাই হচ্ছে জনগণের যুক্তি, তাঁরাও কখনো এই যুক্তি লঙঘন করবেন না। এটা আর একটা মার্কসবাদী নিয়ম। রাশিয়ার জনগণের বিপ্লব এই নিয়ম অনুসরণ করেছিল, চিনা জনগণের বিপ্লবও তাই করছে। "ভ্রম ত্যাগ করো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও" ১৪ আগস্ট, ১৯৪৯।

*** আমরা জয়লাভ করেছি বলেই সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পদলেহী কুকুরদের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতাকে আমরা কোনো মতেই শিথিল করতে পারি না, যে কেউ এ সতর্কতা শিথিল করে সেই রাজনীতিগতভাবে নিজেকে নিরস্ত্র করে ফেলে এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এনে ফেলে। "নয়া রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রস্তুতি কমিটিতে প্রদত্ত ভাষণ" (১৫ জুন, ১৯৪৯)

*** সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের পদলেহী কুকুর চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা চীনের এই ভূমিতে নিজেদের পরাজয় মেনে নেবে না। তারা পারস্পরিক

যোগসাজশে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে চীনা জনগণের বিরোধিতা করতে থাকবে। ধরা যাক, বিভেদ ও গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য তারা তাদের দালালদের চীনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। এটা নিশ্চিত, তারা কখনও এ কাজগুলো ভুলবে না। আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানি দিয়ে এমনকি তাদের নিজেদের শক্তির সংযোগে চীনা সামুদ্রিক বন্দরগুলো অবরোধ করবে। যতদিন পর্যন্ত সম্ভব তারা এমনি করবে। অধিকন্তু, যদি তারা কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য লালায়িত থাকে, তাহলে তারা চীনের সীমান্তকে আক্রমণ বা উপদ্রব করার জন্য কিছু কিছু সৈন্যদল প্রেরণ করবে, এটাও অসম্ভব নয়। এসব আমাদের অবশ্যই পূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে। ঐ

*** পৃথিবী এগিয়ে চলছে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ইতিহাসের এই সাধারণ ধারাকে কেউই বদলাতে পারবে না। আমাদের অবশ্যই বিশ্ব-অগ্রগতির অবস্থা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সর্বদা প্রচার চালাতে হবে, যাতে বিজয়ের উপর জনগণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন। "ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** চিনা গণমুক্তিফৌজের সমস্ত কমান্ডার ও যোদ্ধাদের নিজেদের সংগ্রামি মনোবলকে শিথিল করা উচিত নয়। সংগ্রামি মনোবলকে শিথিল করার ও শত্রুকে ছোট করে দেখার যে কোনো চিন্তাই ভুল। "চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রিয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশ নে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ

*** সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা হচ্ছে কাগুজে বাঘ। প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখতে ভয়াবহ, কিন্তু বাস্তবে তারা তত শক্তিশালী নয়। দূরদৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলরা নয়, জনগণই প্রকৃতপক্ষে প্রবল শক্তির অধিকারী।
মার্কিন সাংবাদিক আন্না লুইস স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ (আগস্ট, ১৯৪৬)

*** পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট নয় (অর্থাৎ বিপরীতের একত্বের নিয়ম), ঠিক একইভাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাও দ্বৈত প্রকৃতিবিশিষ্ট, তারা একই সময়ে খাঁটি বাঘ ও কাগুজে বাঘ। ইতিহাসে ক্রীতদাসের মালিক শ্রেণি, সামন্ত জমিদার শ্রেণি এবং বুর্জোয়া শ্রেণি শাসনক্ষমতা দখলের পূর্বে ও পরে কিছুদিন প্রাণবন্ত, বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল ছিল, তারা খাঁটি বাঘই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বিপরীত পক্ষ, অর্থাৎ ক্রীতদাস শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি এবং সর্বহারা শ্রেণি ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং অধিক থেকে অধিকতর তীব্রভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলো, ফলে এই শাসক শ্রেণি ধাপে ধাপে বিপরীতে পরিবর্তিত হলো প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠীতে, পশ্চাৎপদ মানুষে ও কাগুজে বাঘে পরিবর্তিত হলো, তারা অবশেষে জনগণের দ্বারা উচ্ছেদ হলো বা উচ্ছেদ হবে। জনগণের জীবনমরণ সংগ্রামের সম্মুখীন হবার সময়েও প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ, এবং ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণিগুলো দ্বৈত প্রকৃতি বজায় রেখেছে। একদিকে তারা খাঁটি বাঘই—তারা মানুষ খায়, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে ভক্ষণ করে। জনগণের সংগ্রামের কাজকে দুরূহ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হবার সময়ে অনেক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। চীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন ধ্বংস করার জন্য চীনা জনগণের একশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, প্রায় কয়েক কোটি মানুষের প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল, শুধু তার ফলেই ১৯৪৯ সালে বিজয়লাভ হয়েছে। দেখুন, এরা কি জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ এবং খাঁটি বাঘ ছিল না? কিন্তু পরিশেষে তারা কাগুজে বাঘে, মৃত বাঘে এবং বড়ির বাঘে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য। মানুষ কি এসব তথ্য দেখেনি বা শোনেনি? বাস্তবিকই এই ধরনের হাজার হাজার সহস্র সহস্র বাস্তব তথ্য রয়েছে! সুতরাং বিষয়ের সারবস্তুকে

বিবেচনা করে, দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে এবং রণনীতির দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রকৃতপক্ষে কাগুজে বাঘ বলেই দেখতে হবে। এর উপরই আমাদের রণনীতিগত চিন্তাধারা স্থাপন করা উচিত। অপরপক্ষে, তারা জ্যান্ত, লৌহ নির্মিত এবং খাঁটি বাঘও বটে, যা মানুষ খায়। এর উপরই আমাদের কৌশলগত ও যুদ্ধকৌশলগত চিন্তাধারা স্থাপন করা উচিত। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর উছাং অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ" (১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮)

*** আমি বলেছিলাম যে, সমস্ত তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীলরাই কাগুজে বাঘমাত্র। কারণ তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। দেখুন, হিটলার কি কাগুজে বাঘ ছিল না? হিটলারের কি উচ্ছেদ হয়নি? আমি আরও বলেছিলাম, রাশিয়ার জার, চীনের সম্রাট এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সকলেই ছিল কাগুজে বাঘ। দেখুন, তাদের সকলেরই উচ্ছেদ হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এখনো উচ্ছেদ ঘটেনি। এবং এর হাতে এটম বোমা আছে; আমি দেখছি এটাও উচ্ছেদ হবে, এটাও একটা কাগুজে বাঘ। "বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১৮ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** 'পাথর তুলে নিজের পায়ে আঘাত করা, কোনো নির্বোধ লোকের আচরণের বর্ণনার জন্য এটা হচ্ছে চীনের একটা প্রচলিত প্রবাদ। সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরাই এ রকম নির্বোধ লোক। বিপ্লবী জনগণের উপর তাদের নানা প্রকারের অত্যাচার, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কেবল আরও ব্যাপক ও তীব্রতার গণবিপ্লবের প্রেরণা দিতে পারে। রাশিয়ার জার ও চিয়াং কাইশেক যে বিপ্লবী জনগণের উপর নানা প্রকারের অত্যাচার করেছিল, সেটা কি মহান রুশ বিপ্লব ও মহান চীনা বিপ্লবের জন্য এই ধরনের প্রেরণার ভূমিকা গ্রহণ করেনি? "মহান অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** বিগত নয় বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের ভূখণ্ড তাইওয়ান দখল করে রেখেছে; আবার কিছুদিন আগে তারা সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে লেবানন আক্রমণ করে অধিকার করে রেখেছে। আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের বহু দেশে কয়েক শ' সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। চীনের ভূখণ্ড তাইওয়ান, লেবানন এবং বিদেশে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গলায় জড়ানো ফাঁসির দড়ি। এই ফাঁসির দড়িগুলো আর কেউ নয়, বরং মার্কিনীরা নিজেরাই প্রস্তুত করেছে। এবং তারা নিজেরাই তা নিজেদের গলায় জড়িয়েছে, আর ফাঁসির দড়ির অপর প্রান্ত চীনা জনগণ, আরব দেশগুলোর জনগণ ও পৃথিবীর সমস্ত দেশের

শান্তিপ্রিয়, আক্রমণবিরোধী জনগণের হাতে তুলে দিয়েছে। মার্কিন হামলাকারীরা যত বেশি সময় এ সমস্ত দেশে থাকবে তাদের গলার ফাঁস ততই শক্ত হবে। "সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

*** সাম্রাজ্যবাদীরা বেশি দিন টিকে থাকবে না, কারণ তারা সব সময়ই কুকর্ম করে, সমস্ত দেশেই জনগণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের লালন পালনে রত থাকে, বহু উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ এবং সামরিক ঘাঁটি বলপূর্বক দখল করেছে এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়ে শান্তিকে বিপদগ্রস্ত করছে। ফলে, সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি লোক বাধ্য হয়েই তাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রামে রুখে দাঁড়াচ্ছেন বা রুখে দাঁড়াবেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও বেঁচে আছে এবং এখনও তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যথা-ইচ্ছা জুলুম চালাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগতে তারা এখনও নিজ-নিজ দেশের জনসাধারণকে অত্যাচার করছে। এইরূপ অবস্থাকে অবশ্যই বদলাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটানো সারা দুনিয়ার জনগণের কর্তব্য। "সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার" (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

*** মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্রই যথা-ইচ্ছা জুলুম চালাচ্ছে, ফলে নিজেকে সারা দুনিয়ার জনগণের শত্রুতে পরিণত করেছে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বেশি করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে। সমস্ত লোক যারা গোলাম হতে নারাজ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের এটম বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা কখনও তাদের ভীত করতে পারবে না। মার্কিন হামলাকারীর বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার জনগণের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ হচ্ছে দুর্বার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে মহত্তর বিজয় লাভ করবে। "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পানামার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দেশপ্রেমমূলক সংগ্রামের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (১২ জানুয়ারী, ১৯৬৪)

*** মার্কিন একচেটে পুঁজিপতিচক্র যদি তাদের আক্রমণ নীতি ও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য জেদ করে, তাহলে সেদিন অবশ্যই আসবে যেদিন সারা দুনিয়ার জনগণ তাদেরকে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। অন্যান্য মার্কিন অনুচরদেরও ঠিক একই পরিণতি হবে। "সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

*** শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে, রণনীতির দিক থেকে সমস্ত শত্রুকে

আমাদের তুচ্ছ করে দেখতে হবে, যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শত্রুদেরকে অবশ্যই আমাদের তুচ্ছ করে দেখতে হবে, কিন্তু এক একটা বিশেষ প্রশ্নে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। যদি আমরা সামগ্রিকভাবে শত্রুদেরকে তুচ্ছ করে না দেখি, তাহলে আমরা সুবিধাবাদের ভুল করবো। মার্কস, এংগেলস যখন কেবল দুজনমাত্র ছিলেন, তখনই তারা ঘোষনা করেছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে, এক একটা প্রশ্নে, যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে তাদের না দেখি, তাহলে আমরা হঠকারিতাবাদের ভুল করবো। শুধু এক একটা খণ্ডযুদ্ধ করেই যুদ্ধ করা যেতে পারে এবং শত্রুবাহিনী শুধু এক একটা অংশ করেই ধ্বংস করা যেতে পারে। কারখানাও শুধু এক একটা করে নির্মাণ করা যেতে পারে, কৃষক জমি চাষ করতে পারেন কেবলমাত্র খণ্ড খণ্ড করে, খাবার ব্যাপারেও এমনি। রণনীতিগতভাবে আমরা খাবার ব্যাপারটা তুচ্ছ করে দেখিঃ এটা খেয়ে আমরা শেষ করতে পারি। কিন্তু আসলে খাবার সময় আমরা এক এক গ্রাস করে খাই, গোটা একটা ভোজের খাবারকে এক গ্রাসে গেলা সম্ভব নয়। এটাকে বলা হয় পৃথক পৃথক সমাধান, সামরিক গ্রন্থে এটাকে বলা হয়, শত্রুবাহিনীকে একটা একটা করে ধ্বংস করা। "বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১৮ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** আমার মতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা নতুন সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় দু'ধরনের বাতাস প্রবাহিত_ পূবালী ও পশ্চিমী বাতাস। চীনে একটি প্রবাদ আছে_ হয় পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিমী বাতাস পূবালী বাতাসকে দাবিয়ে রাখে।" আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূবালী বাতাস পশ্চিমী বাতাসকে দাবিয়ে রাখছে, এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। ঐ

সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও

*** সারা দুনিয়ার জনগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন, মার্কিন হামলাকারী ও তার সমস্ত পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করুন! সারা দুনিয়ার জনগণ, নির্ভীক হোন, লড়াই করতে সাহসী হোন, বাধা-বিপত্তিতে নির্ভয় হোন, তরঙ্গমালার মতো এগিয়ে চলুন, তাহলে সারা দুনিয়াটাই হবে জনগণের। সমস্ত দানব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবে। "মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কঙ্গোর (লিওপোলডভিল) জনগণের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (২৮ নভেম্বর, ১৯৬৪)

*** মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ও দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট মূল্যায়ন করেছে এবং বুঝেছে যে, সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ শুধু যে ব্যর্থ করতেই হবে তা নয়— তা করা সম্ভবও বটে। যখন আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছিল তখনই আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, এটা শুধু সাময়িক, আঁধার শীঘ্রই কেটে যাবে, একটু পরেই দেখা দেবে ঊষার আলো। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

*** মানবজাতির ইতিহাসে সমস্ত মরণোন্মুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অবশ্যই বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশেষ মরণ কামড় দেয়, কোনো কোনো বিপ্লবীও প্রায়ই তাদের ভেতরকার শক্তিহীনতা ধরতে না পেরে, তাদের বাহ্য শক্তির প্রকাশ দেখে কিছু সময়ের জন্য ভ্রমে পড়ে এবং তারা এই সার সত্যটা ধরতে পারে না যে, শত্রুরা শীঘ্রই ধ্বংস হবে এবং তারা নিজেরা শীঘ্রই জয়ী হবেন। "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ" (১২ অক্টোবর, ১৯৪২)

*** যদি তারা (কুওমিনতাং) যুদ্ধ করে, আমরা তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করবো। বাস্তব ঘটনা এই যে, যদি তারা আক্রমণ করে, তবে আমরা তাদের ধ্বংস করে ফেলবো, তখনই তারা আরাম পাবে। কিছুটা ধ্বংস করলে, কিছুটা আরাম পাবে; অধিক ধ্বংস করলে, অধিক আরাম পাবে; পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করলে, পুরোপুরিভাবে আরাম পাবে। চীনের সমস্যা জটিল, তাই আমাদের মস্তিষ্কও কিছুটা জটিল হওয়া প্রয়োজন। যদি তারা

যুদ্ধ করতে আসে, আমরা যুদ্ধ করবো, আমরা যুদ্ধ করবো শান্তি অর্জনের জন্য। "ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** যদি কেউ আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং পরিস্থিতি লড়াইয়ের অনুকূল হয়, তাহলে আমাদের পার্টি অবশ্যই আত্মরক্ষার জন্য তাকে দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে, সাফ করে, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে (আমরা অবিবেচনার সঙ্গে আঘাত করি না, কিন্তু যখন আঘাত করি তখন আমাদের অবশ্যই জয়ী হতে হবে), আমরা কোনো মতেই প্রতিক্রিয়াশীলদের তর্জন-গর্জনের ভয়ে ভীত হবো না। "কুওমিনতাঙের সঙ্গে শান্তি আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞপ্তি" (২৬ আগস্ট, ১৯৪৫)

*** আমাদের নিজেদের ইচ্ছার কথা হচ্ছে, আমরা একদিনও যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু পরিস্থিতি যদি আমাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করে, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারি। "মার্কিন সাংবাদিক আন্না লুইস স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ" (আগস্ট, ১৯৪৬)

*** আমরা শান্তি চাই, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ নিজের বর্বরোচিত ও যুক্তিহীন দাবি এবং আক্রমণ সম্প্রসারণের ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ চীনা জনগণের একমাত্র সংকল্প এই যে, তারা কোরিয়ান জনগণের সাথে একযোগে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবেন। এর কারণ এই নয় যে, আমরা যুদ্ধপ্রিয়, আমরা বরং অবিলম্বে যুদ্ধ থামাতে ইচ্ছুক, অবশিষ্ট সমস্যা ভবিষ্যতে সমাধান করা যাবে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তা করতে চায় না, তবে তাই হোক, যুদ্ধ চলতে থাক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যত বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে চায়, আমরাও তত বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে প্রস্তুত, যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে যাব, চীনা ও কোরিয়ান জনগণের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। "চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির চতুর্থ অধিবেশন প্রদত্ত ভাষণ" (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)

*** আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে সমস্ত দুর্বল ও অক্ষম চিন্তাধারা দূর করতে হবে। যে সমস্ত দৃষ্টিকোণ শত্রুর শক্তিকে বড় করে দেখে আর জনগণের শক্তিকে ছোট করে দেখে তা সবই ভুল। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

*** নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতির নিজেদের মুক্তির আশা কোনো মতেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের ‘শুভবুদ্ধির’ উপর ন্যস্ত করা উচিত নয়। কেবলমাত্র নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে অটলভাবে সংগ্রাম চালিয়েই তারা বিজয় লাভ করতে পারেন। “মার্কিন-নগো দিন দিয়েম চক্রের দ্বারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর আক্রমণের ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণকে হত্যা করার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিবৃতি” (২৯ আগস্ট, ১৯৬৩)

*** দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ যখনই বেধে উঠুক না কেন, আমাদের ভালভাবে প্রস্তুত থাকতেই হবে। যদি এটা সত্বরই ঘটে, ধরা যাক, আগামীকাল সকালেই ঘটে, তার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই প্রথম দফা। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে, গৃহযুদ্ধকে সাময়িকভাবে আংশিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব এবং গৃহযুদ্ধ সম্ভবত সাময়িকভাবে কতগুলো স্থানীয় যুদ্ধের রূপ নেবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, দ্বিতীয় দফার অবস্থাটা বহু আগে থেকেই চলে আসছে। এক কথায়, আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রস্তুত হলে আমরা যথার্থভাবে হরেক রকমের জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবো। “জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি” (১৩ আগস্ট, ১৯৪৫)

গণ যুদ্ধ

*** বিপ্লবি যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেয়া যেতে পারে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন (২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪)

*** সত্যিকারের লৌহ প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যারা বিপ্লবকে অকৃত্রিমভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ প্রাকার, এটাকে বিনাশ করা যে কোনো শক্তির পক্ষেই অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাকে বিনাশ করবো। বিপ্লবী সরকারের চারপাশে কোটি কোটি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধকে প্রসারিত করে আমরা সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবো এবং সমগ্র চীন অধিকার করতে পারবো। ঐ

*** যুদ্ধের মহান শক্তির গভীরতম উৎস নিহিত রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। জাপান যে আমাদের লাঞ্ছিত করতে সাহস পায়, তার প্রধান কারণ হলো চীনা জনসাধারণের অসংগঠিত অবস্থা। এই ত্রুটি দূর করলেই আগুনের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ একটা বুনো ষাঁড়ের মতো জাপানী আক্রমণকারীরা আমাদের কোটি কোটি জাগ্রত জনগণের সম্মুখীন হবে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নিছক আওয়াজই তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে এবং এই বুনো ষাঁড়টা অবশ্যই পুড়ে মরবে। “দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে” (মে, ১৯৩৮)

*** সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের এমনভাবে লাঞ্ছিত করছে যে, আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আমাদের কেবলমাত্র শাক্তিশালী নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থাকলেই চলবে না, বরং ব্যাপকভাবে গণমিলিশিয়া ডিভিসনও সংগঠিত করতে হবে। এমনি করলে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ আক্রমণ করার সময় এক ইঞ্চিও এগুতে পারবে না। “সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার” (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

*** সামগ্রিক বিপ্লবী যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, জনগণের গেরিলা যুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লাল ফৌজ একজন মানুষের ডান হাত

আর বাম হাতের মতো, জনগণের গেরিলা যুদ্ধ বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র প্রধান শক্তি হিসেবে লালফৌজই থাকতো, তাহলে আমরা হয়ে পড়তাম এক বাহুবিশিষ্ট সেনাপতির মতো। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে যুদ্ধ করার জন্য, ঘাঁটি এলাকার জনগণের অবস্থা হচ্ছে যে, তারা সশস্ত্র জনগণ। ঘাঁটি এলাকায় এগুতে শত্রুরা যে ভয় পায়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই। “চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা” (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রধানত যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়, এতে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু, শুধুমাত্র এগুলোর দ্বারাই নয়, যুদ্ধরত উভয় পক্ষের আত্মমুখী পরিচালনার দক্ষতার দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুগত অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমা লঙঘন করে সামরিক বিশেষজ্ঞ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন না, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই তিনি বিজয় লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং এটা তাঁর অবশ্যই করা প্রইয়োজন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের ক্রিয়ামঞ্চ গড়ে উঠে বাস্তবমুখী বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক প্রাণবান নাট্যানুষ্ঠানই তিনি পরিচালনা করতে পারেন। ঐ

*** যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘নিজেকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা’, এ ছাড়া আর কিছুই নয় (শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ শত্রুকে নিরস্ত্র করা, অর্থাৎ, প্রতিরোধ-শক্তি থেকে শত্রুকে বঞ্চিত করা, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার দেহটা ধ্বংস করা নয়)। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বর্শা আর ঢাল; বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য; আর ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আজকের সব অস্ত্রও এই দুটির পরিবর্ধিত রূপ। বোমারু বিমান, মেশিনগান, দূরপাল্লার কামান এবং বিষাক্ত গ্যাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ; বিমান আক্রমণবিরোধী আশ্রয়স্থল, ইস্পাতের টুপি, কংক্রিট নির্মিত দুর্গাদি ও গ্যাসনিবারক মুখোশ হচ্ছে ঢালের উন্নত রূপ। ট্যাংক হচ্ছে এ দুয়ের সংযোজনে একটা নতুন হাতিয়ার। আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায়, কিন্তু প্রতিরক্ষাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করাও, কারণ শত্রু ধ্বংস না হলে আপনি নিজেই ধ্বংস হবেন। প্রতিরক্ষার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, কিন্তু একই সময়ে আবার প্রতিরক্ষা হচ্ছে আক্রমণের সাহায্যকারী উপায় অথবা আক্রমণ-পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতির উপায়।

পশ্চাদপসরণ হচ্ছে প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ; কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন হচ্ছে আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, যুদ্ধের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা আর গৌণ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা, কারণ কেবলমাত্র বিপুল পরিমাণে শত্রুকে ধ্বংস করেই নিজেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করা যায়। অতএব, শত্রুকে ধ্বংস করার মুখ্য উপায় হিসেবে আক্রমণই হচ্ছে প্রধান, আর শত্রুকে ধ্বংস করার সাহায্যকারী উপায় হিসেবে এবং নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিরক্ষা হচ্ছে অপ্রধান। বাস্তব যুদ্ধে প্রতিরক্ষা যদিও অনেক সময়ে প্রধান, তা সত্ত্বেও বাকী সময়ে আক্রমণই প্রধান, তবু যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে আক্রমণটাই হচ্ছে প্রধান। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের পরিচালক-নীতিই এসেছে একটি মৌলিক নীতি থেকে, অর্থাৎ যথাসম্ভব নিজের শক্তি সংরক্ষণ করা এবং শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা।... যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মবলিদানের উৎসাহ দেওয়াটা কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই মূল্য দিতে হয়, কখনও কখনও অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতে হয়, নিজেকে রক্ষা করা ও এর মধ্যে কি দ্বন্দ্ব নেই? বস্তুত আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, তারা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক। কারণ এ ধরনের বলিদান কেবলমাত্র শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যই যে প্রয়োজন তা নয় বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্যও দরকার আংশিক ও সাময়িক 'অসংরক্ষণ' (বলিদান বা মূল্যদান) সামগ্রিক ও চিরকালীন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন। এই মৌলিক নীতি থেকে উদ্‌ভূত হয় সমগ্র সামরিক কার্যকলাপের পরিচালক-নীতিগুলো—গুলি ছোড়ার নীতি (নিজেকে রক্ষা করার জন্য আড়ালে থাকা এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য নিপুণভাবে গুলিচালনা করা) থেকে শুরু করে রণনীতিগত নীতি পর্যন্ত সবই এই মৌলিক নীতির ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টেকনিক, যুদ্ধকৌশল, খণ্ডযুদ্ধ ও রণনীতি সম্পর্কে সকল নীতিই হচ্ছে এই মৌলিক নীতিকে কার্যকরী করার শর্ত। নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার নীতি হচ্ছে সমস্ত সামরিক নীতির ভিত্তি। "জাপানবিরোধী গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (মে, ১৯৩৮)

*** আমাদের সামরিক নীতি হচ্ছে:

(১) প্রথমে ছড়ানো ও বিচ্ছিন্ন শত্রুদেরকে আঘাত করা, তার পরে কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী শত্রুদেরকে আঘাত করা।

(২) প্রথমে ছোট ও মাঝারি আকারের শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলগুলো দখল করা, তার পরে বড় শহরগুলো দখল করা।

(৩) শত্রুর কার্যকরী শক্তিকে ধ্বংস করাটাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য, শহর ও জায়গা রক্ষা করা বা দখল করাটা প্রধান লক্ষ্য নয়। শহর ও জায়গাগুলো রক্ষা করা বা দখল করা হচ্ছে শত্রুর কার্যকরী শক্তি ধ্বংস করার ফল, অনেক সময়ে, শুধুমাত্র বহুবার হাত বদলের পরেই শহর ও জায়গাগু লোশেষবারের মতো রক্ষা করা ও দখল করা সম্ভব।

(৪) প্রত্যেক খণ্ডযুদ্ধে নিজের চরম উৎকৃষ্ট সৈন্যশক্তি কেন্দ্রীভূত করা (শত্রুর সৈন্যশক্তির দুই, তিন, চার এমনকি কখনও কখনও পাঁচ বা ছয় গুণের বেশি), শত্রুদের চারদিক থেকে ঘেরাও করা, সম্পূর্ণভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালানো এবং বেড়াজাল থেকে পালিয়ে যেতে না দেওয়া। বিশেষ অবস্থায় শত্রুদের প্রতি মারাত্মক আঘাত করার পদ্ধতি গ্রহণ করা, অর্থাৎ সকল শক্তি জড় করে শত্রুদের সম্মুখে ফ্রন্টে ও এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে আঘাত করা, তার উদ্দেশ্য হবে, শত্রুদের একটা অংশকে ধ্বংস করা ও অপর একটা অংশকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া, যাতে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিজেদের সৈন্যশক্তিকে শত্রুবাহিনীর অন্যান্য অংশকে ধ্বংস করার জন্য তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করতে পারে। যেসব খণ্ডযুদ্ধে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান বেশি অথবা লাভ লোকসান সমান হবে, এমন শক্তিক্ষয়ী যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করা। এমনি করে সমগ্রভাবে আমরা নিকৃষ্ট (সংখ্যার দিক থেকে), কিন্তু প্রত্যেক অংশে এবং প্রত্যেক বাস্তব খণ্ডযুদ্ধে আমরা চরম উৎকৃষ্ট, এটাই আমাদের খণ্ডযুদ্ধের জয়কে নিশ্চিত করে। সময় যত এগুবে আমরা ততই সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠবো এবং অবশেষে সমস্ত শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করবো।

(৫) তৈরি না হয়ে কোনো খণ্ডযুদ্ধ না করা, বিজয় লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো খণ্ডযুদ্ধ না করা, প্রত্যেক খণ্ডযুদ্ধের নিমিত্ত ভালভাবে প্রস্তুতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা, যাতে আমাদের আর শত্রুদের অবস্থার তুলনায় আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৬) বীরত্বপূর্ণভাবে যুদ্ধ করা, আত্মবলিদানের ভয় না করা, ক্লান্তি ভয় না করা ও ক্রমাগত লড়াই করার (অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা কয়েকটা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার) রীতি সম্প্রসারিত করা।

(৭) চলন্ত অবস্থায় শত্রুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা। একই সময়ে অবস্থানগত আক্রমণের যুদ্ধ কৌশলের দিকে মনোযোগ দেওয়া, শত্রুর ঘাটি ও শহরগুলোকে দখল করা। শহরগুলো আক্রমণ সম্পর্কে, শত্রুদের যে সমস্ত ঘাটি ও শহর রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল, দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তা দখল করা। অবস্থা অনুকূল থাকলে শত্রুর যে সমস্ত ঘাঁটি ও শহরের রক্ষা ব্যবস্থা মাঝারি গোছের, সুযোগ বুঝে তা দখল করে নেওয়া। কিন্তু শত্রুর সমস্ত দৃঢ় প্রতিরক্ষাযুক্ত ঘাঁটি ও শহরের বেলায়, যতদিন না সুবিধাজনক অবস্থা ও সুযোগ আসবে, ততদিন অপেক্ষা করা এবং পরে তা দখল করা।

(৯) শত্রুর থেকে কেড়ে নেওয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আর অধিকাংশ বন্দীসৈন্য দিয়ে আমাদের শক্তিকে পূরণ করে নেওয়া। আমাদের ফৌজের জনশক্তি ও সাজসরঞ্জামের প্রধান উৎস হচ্ছে যুদ্ধ ফ্রন্ট।

(১০) দুটি খণ্ডযুদ্ধের মাঝখানে যে সময় পাওয়া যাবে, সেই সময়কে বাহিনীর বিশ্রাম এবং শুদ্ধিকরণ ও ট্রেনিংয়ের জন্য নিপুণভাবে ব্যবহার করা। বিশ্রাম এবং শুদ্ধিকরণ ও ট্রেনিংয়ের জন্য সাধারণভাবে খুব বেশি সময় দেওয়া উচিত নয়, যতদূর সম্ভব, শত্রুদের শ্বাস নেবার সময় পর্যন্ত দেওয়া উচিত নয়।

উপরোল্লেখিত এগুলোই হচ্ছে গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক চিয়াং কাইশেককে পরাজিত করার প্রধান পদ্ধতি। অতীতে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের যুদ্ধের ভেতর দিয়েই গণমুক্তি ফৌজ এইসব পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতেও এইসব পদ্ধতি সম্পূর্ণ উপযোগী... আমাদের রণনীতি ও যুদ্ধকৌশল গড়ে উঠেছে গণযুদ্ধের ভিত্তিতে, দুনিয়ার কোনো জনগণবিরোধী সৈন্যবাহিনীর পক্ষেই আমাদের এই রণনীতি ও যুদ্ধকৌশলকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। “বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য” (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

*** প্রস্তুতিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোনো উদ্যোগও থাকতে পারে না। এ বিষয়টা বুঝতে পারলে, নিকৃষ্ট অথচ প্রস্তুত সৈন্যবাহিনী প্রায়ই আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে। “দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে” (মে, ১৯৩৮)

গণফৌজ

*** গণফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না। “যুক্ত সরকার সম্পর্কে” (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** এই ফৌজ শক্তিশালী, কারণ এর সব সদস্যেরই একটা সচেতন শৃঙ্খলা আছে; তারা অল্পসংখ্যক লোকের বা কোনো একটা সংকীর্ণ চক্রের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, বরং ব্যাপক জনসাধারণের এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের খাতিরে একত্রিত হয়েছেন ও লড়াই করছেন। চীনা জনগণের সঙ্গে একত্রে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো এবং মনেপ্রাণে তাঁদের সেবা করা হচ্ছে এই ফৌজের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ

*** চীনা লাল ফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য একটা সশস্ত্র দল। বিশেষ করে বর্তমানে, লাল ফৌজ যে কেবলমাত্র যুদ্ধই করে, তা অবশ্যই নয়, শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাদেরকে সশস্ত্র করা, বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি সংগঠন স্থাপনের কাজে তাদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও এর কাঁধে তুলে নিতে হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লাল ফৌজ লড়াই করে না, পরন্তু লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য, তাদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাদের সাহায্য করার জন্য; এই সব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে উঠে অর্থহীন, আর লাল ফৌজের অস্তিত্বেরও কোনো তাৎপর্য থাকে না। “পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে” (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** গণমুক্তি ফৌজ সর্বদাই একটা সংগ্রামী বাহিনী। এমনকি দেশব্যাপী বিজয় লাভের পরেও, যখন দেশের ভেতরে শ্রেণি বিলুপ্ত হবে না এবং দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাও থেকে যাবে সে ঐতিহাসিক সময়ে, আমাদের ফৌজ সংগ্রামী বাহিনীই থাকবে। এই বিষয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বিধা থাকতে পারে না। “চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট” (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** আমাদের যুদ্ধ করার জন্য একটা ফৌজ এবং পরিশ্রমের জন্যও একটা ফৌজ আছে। যুদ্ধ করার ফৌজ হিসেবে আমাদের আছে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী; তারাও দুই ধরনের কাজ করে—যুদ্ধ এবং উৎপাদন। কারণ আমাদের দুটি ফৌজ আছে—যুদ্ধ করার ফৌজ ও উৎপাদনের ফৌজ, এ ছাড়া আমাদের যুদ্ধ করার ফৌজ এই দুই ধরনের কাজ করতে সক্ষম এবং জনসারণের মধ্যে কাজ করতে সুনিপুণ, তাই আমরা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পারি। "সংগঠিত হোন" (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করা হবে, কোনো সাম্রাজ্যবাদীকে আমাদের দেশ পুনর্বার আক্রমণ করতে দেওয়া হবে না। নির্ভীক ও সুপরিক্ষিত গণমুক্তি ফৌজের ভিত্তিতে, আমাদের জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে সংরক্ষণ করা ও প্রসারিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের কেবলমাত্র একটা শক্তিশালী স্থলবাহিনীই থাকবে না, বরং একটা শক্তিশালী বিমানবাহিনী এবং শক্তিশালী নৌবাহিনীও থাকবে। "চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

*** আমাদের নীতি হচ্ছে— পার্টি বন্দুককে কমান্ড করে, বন্দুককে কোনো মতেই পার্টির উপর কমান্ড করতে দেওয়া হবে না। "যুদ্ধ ও রণনীতি সমস্যা" (৬ নভেম্বর, ১৯৩৮)

*** আমাদের সমগ্র ফৌজের কমান্ডার ও যোদ্ধাদের অবশ্যই সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা হচ্ছি মহান গণমুক্তি ফৌজ, আমরা মহান চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী। পার্টির নির্দেশ নিয়ত মেনে চললে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। "চীনা গণমুক্তি ফৌজের ঘোষণা" (অক্টোবর, ১৯৪৭)।

পার্টি কমিটির নেতৃত্ব

*** পার্টি কমিটির ব্যবস্থা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং কার্য পরিচালনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের একচেটে হয়ে পড়াটা ঠেকাবার জন্য পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় সংস্থায় (অবশ্যই সমস্ত সংস্থায় নয়) ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কার্য পরিচালনাকে একচেটে করে নেবার এবং ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করার ঝোঁক তীব্র হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান পার্টি কমিটির সভায় স্থির করা হয় না বরং ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা স্থির করা হয়, পার্টি কমিটির সদস্যপদ নামমাত্র হয়ে পড়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যকার মতপার্থক্য মীমাংসা করা অসম্ভব এবং দীর্ঘকাল ধরে তা অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। পার্টি কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কেবলমাত্র বাহ্য ঐক্য বজায় রাখেন, প্রকৃত ঐক্য নয়। এই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। এখন থেকে সমস্ত নেতৃস্থানীয় সংস্থায়—কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো থেকে বিভাগীয় কমিটি পর্যন্ত, ফ্রন্ট কমিটি থেকে ব্রিগেড কমিটি ও সামরিক এলাকার পার্টি কমিটি পর্যন্ত (বিপ্লবী সামরিক কমিটির শাখা অথবা নেতৃস্থানীয় গ্রুপ), সরকারি সংস্থার, গণসংগঠনের, সংবাদ প্রতিষ্ঠানের এবং সংবাদপত্র অফিসের পার্টির নেতৃত্বগ্রুপে পার্টি কমিটির সভার উন্নত ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা (অবশ্যই গুরুত্বহীন নগণ্য সমস্যা অথবা সেইসব সমস্যা যার সমাধান সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়েছে এবং শুধু কার্যকরী করা বাকী আছে সেসব সমস্যা নয়) অবশ্যই কমিটির নিকট আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে, উপস্থিত কমিটির সদস্যদের তাদের মতামত সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা এবং একটি স্পষ্ট ও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত, অতঃপর পৃথক পৃথকভাবে কার্যকরী করতে হবে।... পার্টি কমিটির সভাগুলো অবশ্যই দুভাগে বিভক্ত করতে হবে— স্ট্যান্ডিং কমিটির অধিবেশন এবং পুর্ণাঙ্গ অধিবেশন, দুটিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। অধিকন্তু, যৌথ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব, একটার প্রতি অতিরিক্ত জোর দিয়ে অপরটাকে যেন উপেক্ষা করা না হয়, সেদিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। সৈন্যবাহিনীতে যুদ্ধের সময় এবং অবস্থার প্রয়োজনে, পরিচালকদের জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আছে। "পার্টি কমিটির ব্যবস্থাকে উন্নত করা সম্পর্কে" (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)

*** পার্টি কমিটির সম্পাদকের 'সেকশন লিডার' হতে নিপুণ হওয়া উচিত। একটা পার্টি কমিটিতে দশ থেকে বিশজন সদস্য থাকেন, এটা সৈন্যবাহিনীর একটা সেকশনের মতো এবং সম্পাদক একজন 'সেকশন লিডারের' মতো। বাস্তবিকই এ সেকশনকে উত্তমরূপে পরিচালনা করা সহজ নয়। প্রতিটি কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো এবং উপব্যুরো এখন একটা বিরাট এলাকার নেতৃত্ব করছে এবং অত্যন্ত গুরুকর্তব্য বহন করছে। নেতৃত্বের মানে শুধু নীতি স্থির করাই নয়, বরং সঠিক কর্মপদ্ধতি রচনা করাও। নির্ভুল নীতি থাকা সত্ত্বেও যদি কর্মপদ্ধতিকে অবহেলা করা হয়, তাহলেও সমস্য দেখা দিতে পারে। পার্টি কমিটিকে নিজের নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পন্ন করতে হলে অবশ্যই 'সেকশন সদস্যদের' উপর নির্ভর করতে হবে এবং নিজেদের ভূমিকা পুরোপুরিভাবে পালন করার জন্য তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। ভাল 'সেকশন লিডার' হবার জন্য সম্পাদককে অবশ্যই গভীরভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে। যদি সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নিজেদের সেকশন সদস্যদের মধ্যে প্রচারকার্যে ও সাংগঠনিক কার্যে মনোযোগ না দেন, কমিটির সদস্যদের ও নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ভালভাবে পরিচালিত করতে নিপুণ না হন, অথবা কি করে সভা ভালভাবে চালাতে হয় তা গবেষণা না করেন, তাহলে এই 'সেকশন সদস্যদের' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে অসুবিধায় পড়বেন। 'সেকশন সদস্যরা' যদি পায়ে পা মিলিয়ে অগ্রসর না হন, তাহলে তারা যুদ্ধ ও গঠন কার্যের জন্য কোটি কোটি মানুষের নেতৃত্ব করার আশা কোনো দিনই করতে পারেন না। অবশ্যই সম্পাদক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক এমনি যে, সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের মানবে, সুতরাং 'সেকশন লিডার' ও তাঁর সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে এটা ভিন্ন ধরনের। এখানে আমরা শুধু একটা উপমা তুলে ধরেছি। "পার্টি কমিটির কর্মপদ্ধতি" (১৩ মার্চ, ১৯৪৯)

*** সমস্যা সামনে তুলে ধরা উচিত। এটা যে শুধু 'সেকশন লিডারেরই' করতে হবে, তা-ই নয়, বরং কমিটির সদস্যদেরও করতে হবে। লোকের পিছনে টিপ্পনী কাটবেন না। সমস্যা দেখা দিলে সভা ডাকুন, সমস্যা সামনে তুলে ধরে আলোচনা করুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে। যদি সমস্যা থাকে এবং তা যদি সামনে তুলে ধরা না হয়, তাহলে দীর্ঘদিন ধরে তা অমীমাংসিত থেকে যাবে, এমনকি কয়েক বছর ধরে চাপা থাকবে। 'সেকশন লিডার' ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা দেখানো উচিত। সম্পাদক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যকার, কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রতিটি কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোর মধ্যকার এবং

প্রতিটি কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো ও এরিয়া পার্টি কমিটির মধ্যকার সমঝোতা, সমর্থন ও বন্ধুত্বের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। ঐ

*** 'তথ্য বিনিময় করা'। এর অর্থ হচ্ছে যে, পার্টি কমিটির সদস্যদের যেসব তথ্য জানা আছে, সে সম্পর্কে পরস্পরকে জানানো এবং মতামতের আদান প্রদান করা উচিত। একটা অভিন্ন ভাষা লাভের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো লোক এমনি করে না, বরং লাওৎসি'র বর্ণিত লোকের মতো 'যদিও তাদের মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ পরস্পরের কানে যায়, তবুও তারা সারাজীবন পরস্পর সাক্ষাৎ করে না' ফলে, তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষার অভাব ঘটে। ঐ

*** আপনি যা বুঝেন না অথবা জানেন না, তা অধীনস্থদের জিজ্ঞাসা করুন, আপনার সম্মতি বা আপত্তি অবিবেচিতভাবে ব্যক্ত করবেন না।... আমরা যা জানি না, তা কখনও জানার ভান করা উচিত নয়, 'অধীনস্ত লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করা উচিত নয়', নিম্নস্তরের কেডারদের মতামত শুনতে আমাদের নিপুণ হওয়া উচিত। শিক্ষক হবার পূর্বে আপনি প্রথমে ছাত্র হোন; আদেশ জারী করার পূর্বে নিম্নস্তরের কেডারদের থেকে শিখুন।... নিম্নস্তরের কেডাররা যা বলেন, তা নির্ভুল হতে পারে, নাও হতে পারে, শোনার পর এটা বিশ্লেষণ করা উচিত। নির্ভুল মতামতকে আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হবে... নিম্নস্তর থেকে আসা ভুল মতামতকেও আমাদের শুনতে হবে, একেবারেই না শোনাটা ভুল; কিন্তু এ ধরনের মতামত শুনে সেই অনুসারে কাজ করা উচিত নয়, বরং তার সমালোচনা করা উচিত। ঐ

*** 'পিয়ানো বাজাতে শিখুন। পিয়ানো বাজাতে দশটা আঙুলই চালনা করতে হয়, কয়েকটা আঙুল চালনা করে, অন্যগুলো না করে, এটা চলবে না। আবার দশটা আঙুল দিয়ে এক সঙ্গে চাপ দিলেও মিষ্টি সুরের সৃষ্টি হয় না। উত্তম সুর সৃষ্টির জন্য দশটা আঙুল ছন্দানুসারে এবং পারস্পরিক সহযোজনানুসারে চালাতে হবে। পার্টি কমিটিকে এর কেন্দ্রীয় কর্মকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত এবং একই সময়ে কেন্দ্রীয় কর্মের চারদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজও করা উচিত। বর্তমানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করছি। বিভিন্ন এলাকা, বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর ইউনিট ও বিভিন্ন বিভাগসমূহের কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অন্য সকলকে বাদ দিয়ে শুধু কয়েকটি সমস্যার উপর মনোযোগ দিলে চলবে না। যেখানেই সমস্যা আছে, সেখানেই আমাদেরকে তার উপর অঙ্গুলি স্থাপন

করতে হবে এবং এই পদ্ধতিকে আমাদের অবশ্যই শিখে নিতে হবে। পিয়ানো কেউ বা ভালভাবে বাজান, কেউ বা খারাপভাবে বাজান, এই দুই ধরনের লোকেরা যে সুরের সৃষ্টি করেন তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। পার্টি কমিটির কমরেডদেরকে অবশ্যই ভালভাবে 'পিয়ানো বাজাতে শিখতে হবে। ঐ

*** 'দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত। এর অর্থ যে, পার্টি কমিটি এর প্রধান কাজকে অবশ্যই শুধু 'ধরবে' না বরং 'দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' উচিত। কোনো জিনিস শুধুমাত্র দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং লেশমাত্রও শিথিল না করেই তাকে ধারণ করা যায়। ধরা, কিন্তু দৃঢ়ভাবে নয়, তার অর্থই হচ্ছে মোটেই না ধরা। স্বভাবতই খোলা হাতে কিছু ধারণ করা যায় না। হাতটা যখন মুঠো করা হয়, কিন্তু দৃঢ়ভাবে মুঠোবদ্ধ করা না হয়, তখন ধরার মতো দেখা গেলেও আসলে কিছুই ধরা হয়নি। আমাদের কোনো কোনো কমরেডও প্রধান কাজ ধরেন, কিন্তু তা দৃঢ় করে নয়, তাই কাজেও তারা ভাল করতে পারেন না। মোটেই না ধরলে চলবে না এবং ধরা দৃঢ় না হলেও চলবে না। ঐ

*** মনে 'হিসেব রাখা। এর অর্থ যে, পরিস্থিতি বা সমস্যার পরিমাণগত দিকে আমাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে এবং মৌলিক পরিমাণের বিশ্লেষণ করতে হবে। যে কোনো গুণই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নিজেকে প্রকাশ করে, পরিমাণ ছাড়া গুণ হতেই পারে না। আমাদের বহু কমরেড আজ পর্যন্ত বোঝেন না যে, বস্তুর পরিমাণগত দিকে তাদের মনোযোগ দিতে হবে। মৌলিক পরিসংখ্যান, প্রধান শতকরা অনুপাত এবং পরিমাণগত সীমা যা বস্তুর গুণ নির্ধারণ করে, এইসব দিকে তাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। তাদের মনে কোনো 'হিসেব' নেই, ফলে তারা ভুল না করেই পারে না। ঐ

*** 'জনসাধারণকে আশ্বাসদানের বিজ্ঞপ্তি'। সভার বিজ্ঞপ্তি আগেই দিতে হবে, এটা যেন জনসাধারণকে আশ্বাসদানের বিজ্ঞপ্তি দেবার মতো, যাতে প্রত্যেকেই জানতে পারেন, কি সমস্যার উপর আলোচনা হতে যাচ্ছে, কোন সমস্যার সমাধান করা হবে এবং তারা আগে থেকেই যাতে প্রস্তুতি নিতে পারেন। কোনো কোনো স্থানে প্রথমে রিপোর্ট ও খসড়া প্রস্তাবাদি তৈরি না করেই কেডারদের সভা ডাকা হয় এবং শুধু সভার লোকজন উপস্থিত হলেই কাজ চালানো গোছের, উপস্থিত-মতো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ যেন 'সৈন্য ও ঘোড়া এসে গেছে, কিন্তু খাদ্য ও তৃণাদি প্রস্তুত নেই'

এমন, এটা ভাল নয়। যদি প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে তাড়াহুড়া করে সভা ডাকবেন না। ঐ

*** ‘উন্নততর সৈন্য এবং সহজতর প্রশাসন ব্যবস্থা’। কথাবার্তা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রস্তাব সবই সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া উচিত। সভাও খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়। ঐ

*** আপনাদের সঙ্গে যেসব কমরেড ভিন্ন মত পোষণ করে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে মনোযোগ দিন। স্থানীয় সংগঠনেই হোক বা সৈন্যবাহিনীতে হোক, উভয় ক্ষেত্রেই এ কথায় মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ কথা পার্টি বহির্ভূত লোকের পক্ষেও খাটে। আমরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে সমবেত হয়েছি এবং যেসব কমরেড আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন, শুধু তাঁদের সঙ্গেই নয়, বরং যারা আমাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে নিপুণ হওয়া উচিত। ঐ

*** যথাসাধ্য অহঙ্কার পরিহার করুন। নেতৃস্থানীয় লোকের পক্ষে এটা হচ্ছে নীতিগত সমস্যা এবং ঐক্য বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ শর্তও। গুরুতর ভুল যারা করেননি, বরং নিজেদের কাজে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদেরও অহঙ্কার করা উচিত নয়। ঐ

*** দুটি সীমারেখা স্পষ্ট করে অঙ্কন করুন। প্রথমত বিপ্লব না প্রতিবিপ্লব? ইয়েনান না সিয়ান? কেউ কেউ বুঝেন না যে, এই সীমারেখা অবশ্যই স্পষ্টভাবে আঁকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন তারা আমলাতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করেন, তখন ইয়েনান সম্বন্ধে এমনি করে বলেন যে, যেন সেখানে, ‘কিছুই ঠিক নয়’, ইয়েনানের আমলাতন্ত্রবাদ ও সিয়ানের আমলাতন্ত্রবাদের মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য করেন না। এটা মূলত ভুল। দ্বিতীয়ত বিপ্লবী বাহিনীর ভেতরে ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে, সাফল্য ও ত্রুটির মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে এবং এ দুটির মধ্যে কোনটা মুখ্য ও কোনটা গৌণ, তা স্পষ্ট করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সাফল্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ না ৭০ ভাগ? কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে বললে চলবে না। ব্যক্তি বিশেষের কাজের মৌলিক মূল্যায়ন আমাদের অবশ্যই করতে হবে যে, তাঁর সাফল্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং ভুল শতকরা ৭০ ভাগ, না সাফল্য ৭০ ভাগ এবং ভুল ৩০ ভাগ? যদি তার সাফল্যের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ হয়, তাহলে তার কাজকে মৌলিকভাবে ইতিবাচক বলে স্বীকার করতে

হবে। সাফল্য-প্রধান কাজকে ভুলপ্রধান কাজ বললে সম্পূর্ণরূপেই ভুল হবে। সমস্যা বিচার করতে গেলে, এই দুইটি সীমারেখা টানতে আমাদের অবশ্যই ভোলা উচিত নয়—বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যকার সীমারেখা এবং সাফল্য ও ত্রুটির মধ্যকার সীমারেখা। যদি এই দুটি সীমারেখাকে আমরা মনে রাখি, তাহলে ভালভাবে কাজ করতে পারবো, অন্যথায় আমরা সমস্যার প্রকৃতিকে গুলিয়ে ফেলবো। স্বভাবতই, যদি এই সীমারেখা ভালভাবে আঁকতে হয়, তবে মনোযোগের সঙ্গে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশ্লেষণ ও গবেষণার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। ঐ

*** সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতান্ত্রিক জীবন সুনিশ্চিত করা। তার লাইন হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নির্ভুল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে, যাতে করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

(৩) পার্টির সকল স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সমস্যার সমাধান করা উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, অবশ্যই তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে।

(৪) উচ্চতর সংস্থার যেসব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে অবশ্যই নিম্নতর সংস্থা এবং পার্টি সদস্য সাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে।

(৫) পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি সদস্য সাধারণকে উচ্চতর সংস্থার নির্দেশাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে এর তাৎপর্য তারা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা পালন করার পদ্ধতি স্থির করতে পারেন। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

জনসাধারণের লাইন

*** জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালিকাশক্তি। যুক্ত সরকার সম্পর্কে (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** জনসাধারণ হচ্ছে প্রকৃত বীর, কিন্তু আমরা নিজেরা প্রায়ই হচ্ছি শিশুর মতো অজ্ঞ ও উপহাস্য; এটা জানা না থাকলে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করাও অসম্ভব। 'পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের' ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি মার্চ-এপ্রিল, ১৯৪১

*** জনসাধারণের আছে সীমাহীন সৃজনী শক্তি। তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন, যেখানে নিজদের শক্তির স্ফূরণ করা সম্ভব সেসব স্থানে ও বিভাগে এগিয়ে যেতে পারেন, উৎপাদনের গভীরে ও ব্যাপ্তিতে এগিয়ে যেতে পারেন এবং নিজেদের জন্য দিনে দিনে অধিকতর কল্যাণময় সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন। 'অতিরিক্ত শ্রমশক্তি একটা পথ খুঁজে পেলো' এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের উত্থান একটা অত্যন্ত বিরাট সমস্যা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কয়েকশ' মিলিয়ন কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণির্বত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে, কোনো শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে চেপে রাখতে পারবে না। যেসব বেড়াজাল তাঁদের বেঁধে রাখে, সেসব কিছুকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তারা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবেন। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোককে তারা কবরে পুঁতে রাখবেন। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে গ্রহণ করা বা বর্জন করা তাদের ইচ্ছা। তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাদের নেতৃত্ব করা? না তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের ভেংচি কেটে সমালোচনা করা? অথবা তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বিরোধিতা করা? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি চীনা লোকেরই আছে। কিন্তু পরিস্থিতি আপনাকে সত্বরই বেছে নিতে বাধ্য করবে। "হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্তের রিপোর্ট"(মার্চ, ১৯২৭)

*** বর্তমান গ্রামাঞ্চলের সমবায়করণের সামাজিক রূপান্তরের উত্তাল জোয়ার ইতিমধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় পৌঁছেছে এবং অচিরেই

গোটা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। এ হচ্ছে পঞ্চাশ কোটিরও বেশি পল্লী জনসংখ্যার বিরাটাকারের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন, এর অত্যন্ত মহান বিশ্ব তাৎপর্য রয়েছে। এই আন্দোলনকে আমাদের সক্রিয়, উৎসাহময় ও সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব দিতে হবে এবং বিভিন্ন উপায়ে এটাকে পিছনে টানা উচিত নয়। আন্দোলনের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি অপরিহার্য, এটা বুঝা যায় এবং তা শুদ্ধ করাও কঠিন হবে না। আমরা সক্রিয় সাহায্য দিলেই কেডারদের মধ্যে ও কৃষকদের মধ্যে যে ত্রুটি কিংবা ভুল রয়েছে, তা দূর করা বা শুদ্ধ করা যাবে। "কৃষি সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** জনসাধারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে খুবই বিরাট সমাজতান্ত্রিক সক্রিয়তা। বিপ্লবী যুগেও যারা শুধু পুরনো গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করে চলতে সক্ষম, তারা এই সক্রিয়তাকে একেবারেই দেখতে পান না। তারা অন্ধ, তাঁদের সামনে সবকিছুই অন্ধকার। এমনকি, কখনও কখনও তারা এত দূর যান যে, ভুল নির্ভুল নিয়ে তালগোল পাকিয়ে, দিনকে রাত করে বসেন। এই ধরনের লোক আমরা কি কম দেখেছি? যারা শুধু পুরনো গতানুগতিকতা অনুসারে চলেন, তারা সর্বদাই জনগণের সক্রিয়তাকে ছোট করে দেখেন। নতুন একটা কিছু ঘটলে, তারা সব সময়েই তাকে অগ্রাহ্য করেন, প্রথমে তারা বিরোধিতা করতে ছুটে আসেন এবং পরে পরাজয় মেনে নেন, একটু আত্মসমালোচনাও করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার আবার একটা কিছু নতুন দেখা দিলে, সেই পুরনো ধারাতেই তারা আবার নতুন করে চলেন। নতুন সব কিছুর ব্যাপারেই তারা এই রীতি অনুসরণ করেন। এ ধরনের লোকেরা সব সময়েই নিষ্ক্রিয়, জরুরী মুহূর্তে তারা সর্বদাই নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন এবং এক পা চলতে গেলেও প্রথমে তাঁদের পিঠে ধাক্কা মারতে হয়। "এই থানা দুবছরেই সমবায়ের পথে গেছে-এর ভূমিকালিপি" (১৯৫৫)

*** কুড়ি বছরের বেশি কাল ধরে আমাদের পার্টি প্রতিদিন জনসাধারণের মধ্যে কাজ করছে, বিগত দশ বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিদিনই জনসাধারণের লাইন সম্পর্কে বলছে। আমরা সব সময়েই এই মন্তব্য করে আসছি যে, বিপ্লবকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে জনসাধারণের উপর, নির্ভর করতে হবে কাজে সকলের হাত লাগানোর উপর, শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক লোকের উপর নির্ভর করে হুকুমজারী করার আমরা বিরোধিতা করি। কিন্তু কোনো কোনো কমরেডের কাজকর্মে এখনও জনসধারণের লাইন পুরোপুরি পালিত হচ্ছে না, এখনও তারা শুধু অল্পসংখ্যক লোকের উপর নির্ভর করে নিঃসঙ্গভাবে কাজ করেন। এর

একটা কারণ হচ্ছে এই যে, যা কিছুই তারা করুন না কেন, তাদের দ্বারা পরিচালিত লোকের কাছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে তারা সর্বদা অনিচ্ছুক এবং পরিচালিত লোকের সক্রিয়তাকে ও সৃজনী শক্তিকে স্‌ফুরণের সুযোগ দিতে তাঁরা জানেন না। নিজের দিক থেকে তাঁরাও চান, যাতে প্রত্যেকেই কাজে হাত লাগান, কিন্তু কি করতে হবে এবং কেমন করে তা করতে হবে, সে বিষয়ে অন্যান্য সবাইকে তারা কিছুই জানতে দেন না, এইভাবে সবাই কেমন করে কাজে যোগ দিতে পারেন এবং কেমন করে কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারেন? এই সমস্যা মীমাংসা করতে গেলে, মূলত অবশ্যই মতাদর্শের ক্ষেত্রে জনসাধারণের লাইন সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বাস্তব পদ্ধতিও কমরেডদেরকে অবশ্যই শেখাতে হবে। “শানসী-সুইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা” (২ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শেখায় যে, সমস্ত সঠিক কর্তব্য, সঠিক নীতি ও কর্মরীতি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার উপযোগী এবং জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত; সমস্ত ভুল কর্তব্য, ভুল নীতি ও কর্মরীতিই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার উপযোগী নয় বরং জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। গোঁড়ামিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, হুকুমবাদ, লেজুড়বাদ, সংকীর্ণতাবাদ, আমলাতন্ত্রবাদ এবং কাজকর্মে দাম্ভিক মনোভাব প্রভৃতি ব্যাধিগুলো নিশ্চিতভাবেই খারাপ এবং অসহ্য, যদি কেউ এ ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, তবে তাকে অবশ্যই এসব ব্যাধি সারাতে হবে, কারণ এগুলো জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন। “যুক্ত সরকার সম্পর্কে” (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** নিজেকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে গেলে, জনসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতেই হবে। জনসাধারণের জন্য যেসব কাজ করা হয়, সে সবেরই শুরু হওয়া উচিত জনসাধারণের প্রয়োজন থেকে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের শুভেচ্ছা থেকে নয়। অনেক সময়ে বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও জনসাধারণের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু নিজের দিকে থেকে তারা এখনও সেই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন নন এবং সেই পরিবর্তন সাধনের জন্য এখনও তারা দৃঢ় সংকল্প বা ইচ্ছুক নন, এই অবস্থায় আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে; যখন আমাদের কাজের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ জনসাধারণ এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং পরিবর্তন সাধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছুক হয়ে উঠবেন, কেবলমাত্র তখনই আমরা এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করবো, অন্যথায় আমরা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো।

জনসাধারণ সচেতন ও ইচ্ছুক না হলে, যে কোনো কাজ, যাতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হয়ে উঠবে এবং ব্যর্থ হবে।... এখানে দুটি নীতি রয়েছে— একটা হচ্ছে জনসাধারণের বাস্তব প্রয়োজন, আমরা যাকে তাদের প্রয়োজন বলে কল্পনা করি, সে ধরনের প্রয়োজন নয়; আর অন্যটা হচ্ছে জনসাধারণের নিজস্ব ইচ্ছা, জনসাধারণ নিজেরাই তাঁদের মনস্থির করবেন, তাঁদের হয়ে আমরা যে তাঁদের মনস্থির করবো, তা নয়। "সাংস্কৃতিক কর্মে যুক্তফ্রন্ট" (৩০ অক্টোবর, ১৯৪৪)

*** আমাদের কংগ্রেসের উচিত, সমগ্র পার্টিকে, সতর্ক হতে এবং কর্মের প্রত্যেক শাখায় প্রত্যেক কমরেড যাতে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন না হন, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে আহ্বান জানানো। জনসাধারণকে গভীরভাবে ভালবাসতে এবং জনসাধারণের কথা যত্নের সঙ্গে শুনতে; যেখানেই তিনি যান, সেখানেই জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক করে মিশিয়ে ফেলতে, জনসাধারণের উপর দাঁড়ানো নয় বরং তাদের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করতে; জনসাধারণের চেতনার মান অনুসারে তাদের চেতনাকে জাগরিত ও উন্নত করতে এবং জনসাধারণের আন্তরিক স্ব-ইচ্ছার নীতিতে তাদেরকে ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হতে সাহায্য করতে এবং নির্দিষ্ট স্থান ও কালের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ধাপে ধাপে চালনার জন্য সাহায্য করতে প্রত্যেক কমরেডকে শিক্ষাদান করা উচিত। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** যখন জনসাধারণ সচেতন হননি, তখন যদি আমরা আক্রমণ চালাতে চাই, তা হবে হঠকারিতাবাদ। যদি আমরা জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোনো কাজ করার জন্য তাদেরকে পরিচালিত করতে জেদ করি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবো। জনসাধারণ যখন এগিয়ে যেতে দাবি জানান, তখন যদি আমরা এগিয়ে না যাই, তাহলে তা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। "শানসী-সুইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** যে কোনো কাজে হুকুমবাদ হচ্ছে ভুল, কারণ তা জনসাধারণের চেতনার মান ডিঙ্গিয়ে যায় এবং জনসাধারণের স্ব-ইচ্ছার নীতি লঙ্ঘন করে, তা হচ্ছে তাড়াহুড়াবাদের ব্যাধি। আমাদের কমরেডরা যেন এমন মনে না করেন যে, তাঁরা নিজেরা যা বুঝেন, তা সবই ব্যাপক জনসাধারণও তাঁদের মতো বুঝেন। জনসাধারণ এটা বোঝেন কি না এবং কার্যকরী করতে ইচ্ছুক কি না, এসব জানতে পারা যায় শুধু জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে। এমনি করলে, আমরা হুকুমবাদকে

এড়াতে পারি। যে কোনো কাজে, লেজুড়বাদও হচ্ছে ভুল, কারণ এটা জনসাধারণের চেতনার মানের চাইতে পশ্চাৎপদ এবং তাতে জনসাধারণকে পরিচালিত করে এগিয়ে নেবার নীতিও লঙঘন করা হয়, এটা হচ্ছে ঢিলেমী-ব্যাধি। আমাদের কমরেডরা অবশ্যই যেন মনে না করেন যে, তাঁরা নিজেরা যা এখনও বুঝেন না, জনসাধারণও তা বুঝেন না। অনেক সময়েই, ব্যাপক জনসাধারণ আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেন এবং আরও এক পা বাড়াতে অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকেন, আমাদের কমরেডরা ব্যাপক জনসাধারণের পরিচালক হতে পারেন না, কিন্তু কোনো কোনো পশ্চাৎপদ ব্যক্তির মতামতের প্রতিফলন করেন এবং এই ধরনের পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের মতামতকে ভুল করে ব্যাপক জনসাধারণের মতামত বলে মনে করেন, ফলে তারা পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের লেজুড় হয়ে পড়েন। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** জনসাধারণের ভেতর থেকে মতামত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা, আবার তা জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়ে কার্যকরী করা, যাতে করে নেতৃত্বের নির্ভুল মত গড়ে তোলা যায়, এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের মৌলিক পদ্ধতি। "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১ জুন, ১৯৪৩)

*** আমাদের পার্টির সমস্ত বাস্তব কাজকর্মে সমস্ত নির্ভুল নেতৃত্ব অপরিহার্যভাবেই হচ্ছে— জনসাধারণের থেকে আসা এবং জনসাধারণের মধ্যে যাওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, জনসাধারণের মতামত (ইতস্তত ছড়ানো ও অব্যবস্থিত) সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা (গবেষণার মাধ্যমে তাদের কেন্দ্রীভূত ও সুব্যবস্থিত মতে রূপান্তরিত করা), তারপর, তা নিয়ে জনসাধারণের কাছে গিয়ে প্রচার করা ও ব্যাখ্যা করা, এই মত জনসাধারণের নিজস্ব মতে পরিণত করা, যাতে জনসাধারণ এই মতকে কার্যকরী করেন, কাজে পরিণত করেন এবং এইভাবে জনসাধারণের কার্যক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এই মত ভুল কি নির্ভুল তা যাচাই করে নেওয়া। পুনর্বার জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা এবং জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়ে তা কার্যকরী করা। আর এমনি চলে বারবার, চলে সমাপ্তিহীন ঘূর্ণাবর্ত, ফলে প্রতিবারই এই মত হয়ে উঠে আরও বেশি নির্ভুল, আরও বেশি প্রাণবন্ত এবং আরও বেশি সমৃদ্ধ। এই হচ্ছে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব। *ঐ*

*** আমাদের উচিত জনসাধারণের ভেতরে যাওয়া, জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, তাদের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে উত্তম ও

সুব্যবস্থিত নীতি ও পদ্ধতিতে পরিণত করা, তারপর আবার জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে এগুলো বুঝানো (প্রচার করা) এবং এই নীতি ও পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করা, তাদের সমস্যার সমাধান করা, যাতে করে তারা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করেন। "সংগঠিত হোন" (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** আমাদের কোনো কোনো স্থানের নেতৃস্থানীয় সংস্থায় এমন লোক রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন যে, পার্টির নীতি শুধুমাত্র পরিচালকেরা জানলেই যথেষ্ট, জনসাধারণকে জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন আমাদের কিছু কিছু কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয় না— এটা তার অন্যতম মৌলিক কারণ। "শানসী-সুইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** যে কোনো গণআন্দোলনেই, সক্রিয় সমর্থক, বিরোধী এবং নিরপেক্ষদের সংখ্যার উপরে আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক তদন্ত এবং মৌলিক বিশ্লেষণ চালাতে হবে। আত্মমুখী ও ভিত্তিহীনভাবে সমস্যা স্থির করা উচিত নয়। "পার্টি কমিটির কর্মপদ্ধতি" (১৩ মার্চ, ১৯৪৯)

*** যে কোনো স্থানের জনসাধারণই সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত, অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, মধ্যবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। তাই, অল্পসংখ্যক সক্রিয় ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্বের মেরুদণ্ড হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করতে পরিচালকদের অবশ্যই নিপুণ হতে হবে, এই ধরনের মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করেই মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের উন্নত করতে হবে, পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১ জুন, ১৯৪৩)

*** পার্টির নীতিকে জনসাধারণের কার্যকলাপে রূপায়িত করতে নিপুণ হওয়া, আমাদের প্রত্যেকটি আন্দোলন ও প্রত্যেকটি সংগ্রামকে যাতে শুধু নেতৃস্থানীয় কেডাররাই নয়, বরং ব্যাপক জনসাধারণও বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারেন সেজন্য চেষ্টা করতে নিপুণ হওয়া, এটাই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বের একটা কৌশল। আমাদের কর্মে আমরা ভুল করি বা না করি, তার সীমারেখাও এটা নির্ধারণ করে। "শানসী-সুইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** যদি শুধুমাত্র নেতৃত্ব-মেরুদণ্ডের সক্রিয়তা থাকে এবং তা ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয়তার সঙ্গে সংযুক্ত না হয়, তাহলে সে সক্রিয়তা হয়ে

উঠবে অল্পসংখ্যক লোকের নিষ্ফল প্রয়াস। পক্ষান্তরে, যদি কেবলমাত্র ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয়তা থাকে এবং তাঁদের এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে সংগঠিত করার জন্য যদি না একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-মেরুদণ্ড থাকে, তাহলে জনসাধারণের সক্রিয়তা দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে না, সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে না এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারে না। "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১ জুন, ১৯৪৩)

*** জনসাধারণের উৎপাদন, জনসাধারণের স্বার্থ, জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও মনোভাব— এই সবের দিকে নেতৃস্থানীয় কেডারদের অবশ্যই সতত মনোযোগ দিতে হবে। "পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও সামরিক কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলোর উৎপাদন প্রদর্শনী উপলক্ষে অভিলেখন, ইয়েনান, 'মুক্তি দৈনিক'" (২৪ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** ভূমি ও শ্রম সমস্যা থেকে শুরু করে জ্বালানী, চাল, রান্নার তেল ও লবনের সমস্যা পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্যার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে।... জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্ত সমস্যাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দিতে হবে। সেগুলোকে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, কার্যকরী করতে এবং তার ফলাফলের উপর পরীক্ষা করতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণকে আমাদের বুঝানো উচিত যে, আমরা তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের উত্থাপিত উচ্চতর কর্তব্যকে, বিপ্লবী যুদ্ধের কর্তব্যকে যেন তাদের বুঝানো হয়, যাতে করে তারা বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে সাড়া দেন। এবং বিপ্লবের জয়লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন। "জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন" (২৭ জানুয়ারী, ১৯৩৪)

রাজনৈতিক কাজ

*** সে সময়ে [অর্থাৎ ১৯২৪-১৯২৭ প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় (সম্পাদক)] সৈন্যবাহিনীতে পার্টি প্রতিনিধির ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ ধরনের ব্যবস্থা চীনের ইতিহাসে আর কখনও ছিল না, এ ধরনের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছে। ১৯২৭ সালের পরের লাল ফৌজ ও আজকের অষ্টম রুট বাহিনী, এই ব্যবস্থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এটাকে উন্নত করেছে। "বৃটিশ সাংবাদিক জেম্‌স বারট্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার" (২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭)

*** গণযুদ্ধের ভিত্তিতে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্যের, কমান্ডার ও যোদ্ধাদের ঐক্যের নীতির ভিত্তিতে তথা শত্রুবাহিনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা প্রভৃতি নীতির ভিত্তিতে গণমুক্তি ফৌজ নিজেদের শক্তিশালী বিপ্লবী রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

*** এই সৈন্যবাহিনী গণযুদ্ধের অপরিহার্য রাজনৈতিক কাজের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, এর কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা, মিত্রবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা, মিত্রবাহিনীগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও যুদ্ধে বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম করা। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** রাজনৈতিক কাজ হচ্ছে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজের প্রাণসূত্র। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে এ কথাটা বিশেষভাবে সত্য। "একটা গুরুতর শিক্ষা" —এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** লাল ফৌজ কেন যে এই দুরূহ অবস্থায় যুদ্ধ করে অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেলো তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে 'কোম্পানিতে পার্টি শাখা গঠিত হয়'। "চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫ নভেম্বর, ১৯২৮)

*** অষ্টম রুট বাহিনীর রাজনৈতিক কাজের মৌলিক নীতি হচ্ছে তিনটা। প্রথম— অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্যের নীতি, এর অর্থ যে, সৈন্যবাহিনী থেকে সামন্তবাদ নির্মূল করা, মারধোর ও গালাগালের ব্যবস্থা উঠিয়ে

দেওয়া, সচেতন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা এবং সবাই এক সঙ্গে সুখদুঃখের ভাগ নিয়ে জীবনযাপন করা, যার ফলে, গোটা বাহিনীই হয় ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ। দ্বিতীয়— সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্যের নীতি, এর অর্থ, জনসাধারণের স্বার্থের লেশমাত্র লঙঘন ও নিষিদ্ধ করার শৃঙ্খলাকে বজায় রাখে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, তাঁদের সংগঠিত করা ও সশস্ত্র করা, তাদের অর্থনৈতিক বোঝা হাল্কা করা এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ক্ষতিসাধনকারী বিশ্বাসঘাতক ও স্বদেশ বিক্রয়কারীদের আঘাত করা, এর ফলে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হয়ে উঠে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণ সর্বত্রই সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানান। তৃতীয় শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার ও যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নীতি। আমাদের বিজয় শুধুমাত্র আমাদের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ করার উপরই নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার উপরেও। "বৃটিশ সাংবাদিক জেমস বারট্রামের সঙ্গে সাক্ষাঙ্কার" (২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭)

*** সৈন্যবাহিনী ও জনগণের, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের, সৈন্যবাহিনী ও পার্টির, অফিসার ও সৈনিকদের, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের সম্পর্ক এবং কেডারদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই নির্ভুল নীতি অনুসরণ করতে হবে, কোনো মতেই যুদ্ধবাজবাদের ব্যাধিতে সংক্রমিত হওয়া উচিত নয়। অফিসারদেরকে অবশ্যই সৈনিকদের যত্ন নিতে হবে, তাদের প্রতি উদাসীন হওয়া কিংবা তাদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া চলবে না; সৈন্যবাহিনী অবশ্যই জনগণকে ভালবাসবে, তাদের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারবে না; সৈন্যবাহিনী অবশ্যই সরকার ও পার্টিকে সম্মান করবে, কোনো ক্রমেই স্বতন্ত্রতার দাবি করতে পারবে না। "সংগঠিত হোন" (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** জাপানী বাহিনী, তাঁবেদার অথবা কমিউনিস্ট বিরোধী সৈন্যবাহিনী থেকে ধৃত বন্দীদের সম্পর্কে— যারা জনগণের কাছ থেকে তীব্র ঘৃণা পেয়েছে, তাদের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে হবে এবং যাদের মৃত্যুদণ্ড উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তারা ছাড়া আর সকলকে মুক্তি দেবার নীতি আমাদের অবলম্বন করা উচিত। বন্দীদের মধ্যে যারা বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের প্রতি কম বেশি ঝোঁক আছে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় আমাদের পক্ষে টেনে আনতে হবে, অবশিষ্ট সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি তারা আবার লড়ে ও ধরা পড়ে তাহলেও আবার ছেড়ে দিতে হবে; তাদের অপমান করা উচিত নয়, তাদের

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তালাশ করা উচিত নয় অথবা তাদের থেকে অনুশোচনা পত্র নেবার চেষ্টা করাও উচিত নয় বরং বিনা ব্যতিক্রমে তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সদয় ব্যবহার করা উচিত। তারা যত প্রতিক্রিয়াশীলই হোক না কেন, এই নীতিই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এটা খুবই কার্যকরী। "নীতি সম্পর্কে" (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

*** অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়; নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। শক্তির তুলনা শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তুলনাই নয়, বরং জনশক্তি ও নৈতিক শক্তিরও তুলনা। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে (মে, ১৯৩৮)

*** এটম বোমা হচ্ছে কাগুজে বাগ, জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য মার্কিনী প্রতিক্রিয়াশীলরা এটা ব্যবহার করে, এটা দেখতে ভয়াবহ, কিন্তু আসলে তা নয়। নিশ্চয়ই এটম বোমা একটা বিরাটাকারের গণহত্যার অস্ত্র, কিন্তু যুদ্ধের হারজিতকে জনগণই নির্ধারণ করেন, দুএকটা নতুন ধরনের অস্ত্র নয়। "মার্কিন সাংবাদিক আন্না লুইস স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ" (আগস্ট, ১৯৪৬)

*** সৈন্যবাহিনীর ভিত্তি হচ্ছে সৈনিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রেরণার দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত না করলে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ না চালালে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য অর্জন করা অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে জাপানবিরোধী যুদ্ধের অনুকূলে অফিসার ও সৈনিকদের উৎসাহকে সর্বাধিক মাত্রায় উদ্দীপিত করা, সমস্ত টেকনিক ও যুদ্ধকৌশল যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। "দীঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** লাল ফৌজের কোনো কোনো কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই বিকাশ লাভ করেছে। এটা নিজেকে এইভাবে প্রকাশ করে:

(১) এইসব কমরেড সামরিক ব্যাপার ও রাজনীতিকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেন এবং সামরিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্রমাত্র, এ কথা তারা অস্বীকার করেন। এমনকি কেউ কেউ আরও বলেন, "সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে স্বভাবতই রাজনীতিতে ভাল হবে, সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিও ভাল হতে পারে না।"

এইভাবে তারা আরও দূরে চলে গেছেন, তাঁদের মতে সামরিক ব্যাপার রাজনীতির উপর নেতৃত্ব করে।... "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** মতাদর্শগত শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরাটা হচ্ছে গোটা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোর মূল চাবিকাঠি। এই কর্তব্য সম্পাদন না করলে পার্টির কোনো রাজনৈতিক কর্তব্যই সম্পন্ন হতে পারে না। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** সম্প্রতি, বুদ্ধিজীবী ও যুব-ছাত্রদের মধ্যে মতাদর্শগত রাজনৈতিক কাজে ভাটা পড়েছে এবং কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর ঝোঁক দেখা দিয়েছে। মনে হয়, কিছু লোকের চোখে, কি রাজনীতি, কি মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ, কি মানবজাতির আদর্শ, এ সবের উপরে মনোযোগ দেবার আর কোনো প্রয়োজন নেই, যেন মার্কসবাদ এক সময়ে বেশ চালু ছিল, কিন্তু এখন আর তেমন চালু নয়। এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য এখন অবশ্যই মতাদর্শগত রাজনৈতিক কাজকে দৃঢ়তর করতে হবে। বুদ্ধিজীবী ও যুব-ছাত্র উভয়েরই কঠোরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ছাড়া মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অবশ্যই অগ্রগতি লাভ করতে হবে, এর জন্যই মার্কসবাদ, বর্তমান ঘটনাবলী ও রাজনীতি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকাটা আত্মা না থাকারই সমান।... মতাদর্শগত রাজনৈতিক কাজে সব বিভাগকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি, যুবলীগ, এ কাজের ভারপ্রাপ্ত সরকারি বিভাগ এবং বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক ও শিক্ষকদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে, লাল ফৌজের সৈনিকরা সবাই শ্রেণিচেতনা লাভ করেছেন এবং জমিবণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন, শ্রমিক কৃষকদের সশস্ত্র করা প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছেন। তারা সবাই জানেন যে, তারা লড়ছেন নিজেদের জন্য এবং শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির জন্য। তাই, তারা দুরূহ সংগ্রামের মধ্যেও কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। প্রত্যেকটি কোম্পানি, ব্যাটেলিয়ান ও রেজিমেন্টে সৈনিক সমিতি গঠন করা হয়েছে, এই সমিতি সৈনিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে,

রাজনৈতিক কাজ এবং জনসাধারণের মধ্যকার কাজও করে। "চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫ নভেম্বর, ১৯২৮)

*** দুঃখ দুর্দশা (পুরনো সমাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রমজীবী জনগণকে যে দুঃখ কষ্ট দিয়েছে) সম্পর্কে বলার ও তিনটা যাচাই করার (শ্রেণির উৎপত্তির যাচাই, কাজের যাচাই, সংগ্রামী মনোবলের যাচাই) আন্দোলন সঠিকভাবে চালনার ফলে শোষিত শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তির জন্য, দেশব্যাপী ভূমিসংস্কার ও জনগণের সাধারণ শত্রু চিয়াং কাইশেক দস্যুদলের বিনাশসাধনের জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার ও যোদ্ধাদের সংগ্রামের চেতনা বিপুল পরিমাণে উন্নত হয়েছিল; একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সব কমান্ডার ও যোদ্ধাদের দৃঢ় ঐক্য আরও দৃঢ়তর হয়েছিল। এর ভিত্তিতে, সৈন্যবাহিনীতে অধিকতর বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়েছে, শৃঙ্খলা দৃঢ়তর হয়েছে, ব্যাপক সামরিক ট্রেনিং আন্দোলন বিস্তারিত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ সুপরিচালিত ও সুশৃঙ্খলিতভাবে চালিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গণতন্ত্র আরও বিকশিত হয়েছে। এইভাবে সৈন্যবাহিনীর সকলের হৃদয় একই সূত্রে গেঁথে গেছে, প্রত্যেকেই তার ধারণা ও শক্তি ঢেলে দেন, আত্মবলিদানকে ভয় করেন না এবং বৈষয়িক অসুবিধা অতিক্রম করেন, সম্মিলিত বীরত্ব ও দুর্বার সাহস প্রদর্শন করে শত্রুর বিনাশসাধন করেন। এ ধরনের সৈন্যবাহিনীই পৃথিবীতে অজেয়। "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট বিজয় সম্পর্কে এবং মুক্তি ফৌজের নতুন ধরনের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন সম্পর্কে" (৭ মার্চ, ১৯৪৮)

*** বিগত কয়েক মাসে গণমুক্তি ফৌজের প্রায় সমস্ত ইউনিট লড়াইয়ের মধ্যে যে অবকাশ পেয়েছিল, তা ব্যবহার করে ব্যাপক আকারে শুদ্ধিকরণ ও ট্রেনিং চালিয়েছিল। এটা চালানো হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সুপরিচালিত, সুশৃঙ্খলিত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ফলে, এটা উদ্দীপ্ত করে তুলেছে ব্যাপক কমান্ডার ও যোদ্ধাসাধারণের বিপ্লবী উৎসাহ, যুদ্ধের লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে বুঝতে তাদের করেছে সমর্থ, সৈন্যবাহিনীতে যেসব বেঠিক মতাদর্শগত ঝোঁক ও অবাঞ্ছনীয় অভিব্যক্তি দেখা যায় সেগুলোকে বিলোপ করেছে, কেডার আর যোদ্ধাদের শিক্ষিত করেছে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তিকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সৈন্যবাহিনীর গণতান্ত্রিক ও ব্যাপক প্রকৃতির এই নতুন ধরনের শুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে আমাদের অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। "শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** জাপানবিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজের শিক্ষানীতি হচ্ছে দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা, কঠোর ও সরল কর্মরীতি এবং নমনীয় রণনীতি

ও যুদ্ধকৌশল। জাপানবিরোধী বিপ্লবী সৈন্য গড়ে তোলার জন্য এই তিনটা হচ্ছে অপরিহার্য উপাদান। কলেজের কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্ররা এই তিনটা উপাদান অনুসারে শিক্ষা দেন ও শিখেন। “শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল, খারাপ নয়” (২৬ মে, ১৯৩৯)

*** কঠোর সংগ্রামের একটা ঐতিহ্যগত রীতি আমাদের জাতির সর্বদাই রয়েছে, এটাকে আমাদের বিকশিত করতে হবে।... এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশার পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদাই প্রচার করে আসছে... কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতি থেকে এই দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা অবিচ্ছেদ্য দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা বাদ দিলে, কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতিকে উদ্দীপ্ত করা অসম্ভব; আবার কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতিকে বাদ দিলে, দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা অনুসরণ করাও অসম্ভব। “আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ইয়েনান সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ” (১ মে, ১৯৩৯)

*** ঐক্যবদ্ধ, উত্তেজনাময়, ভাব-গম্ভীর ও প্রাণবন্ত হোন। “জাপানবিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজের আদর্শ-বাণী”

*** পৃথিবীতে সব কিছুই ‘গভীর মনোযোগ’ শব্দটা ভয় করে, কিন্তু কমিউনিস্টরা এর উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। “মস্কোতে চিনা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানবীসদের সাক্ষাতদানকালে প্রদত্ত ভাষণ” (১৭ নভেম্বর, ১৯৫৭)

অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক

*** আমাদের সৈন্যবাহিনীতে সর্বদাই দুটি নীতি; প্রথম, শত্রুদের প্রতি আমাদের অবশ্যই নির্মম হতে হবে, তাদের দাবিয়ে রাখতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে; দ্বিতীয়, নিজেদের প্রতি, জনগণের প্রতি, কমরেডদের প্রতি, উপরস্থ ও অধীনস্থদের প্রতি স্নেহময় হতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। "রিয়ার আর্মি ডিট্যাচমেন্ট থেকে আদর্শ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের সম্মানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণ" (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** আমরা সবাই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছি এবং একই বিপ্লবী উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হয়েছি।... আমাদের কেডারদেরকে প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতি যত্নবান হতে হবে, বিপ্লবী বাহিনীর সমস্ত লোককেই পরস্পরের যত্ন নিতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে ও সাহায্য করতে হবে। "জনগণের সেবা" (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** প্রতি ইউনিটে কেডারদের সমর্থন করার জন্য ও সৈনিকদের ভালবাসার জন্য একটা আন্দোলন চালাতে হবে, সৈনিকদের ভালবাসার জন্য কেডারদের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং একই সময়ে কেডারদেরকে সমর্থন করার জন্য সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে, পরস্পরের ভুল-ত্রুটি খোলাখুলিভাবে বলা উচিত এবং তাড়াতাড়ি সেসব ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা উচিত, এভাবে তারা একটা চমৎকার অভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করতে পারবেন। "১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

*** অনেকে মনে করেন যে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক অসন্তোষজনক হবার কারণ হচ্ছে পদ্ধতি ভুল; আমি সব সময়েই তাদের বলি যে, এটা হচ্ছে মৌলিক মনোভাবের (অথবা মৌলিক উদ্দেশ্যের) প্রশ্ন, এই মনোভাব হচ্ছে সৈনিক ও জনগণকে সম্মান করা। এই মনোভাব থেকে বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি ও রূপের উদ্ভব ঘটে। যদি এই নীতি মনোভাব থেকে দূরে সরে যাই, তাহলে নীতি, পদ্ধতি ও রূপ নিশ্চয়ই ভুল হবে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই অসন্তোষজনক হবে। সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কাজের তিনটা প্রধান নীতি হচ্ছে—প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্য; দ্বিতীয়, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য; তৃতীয়, শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা। এই নীতিগুলোকে কার্যকরীভাবে

প্রয়োগ করার জন্য সৈনিকদের সম্মান করা, জনগণকে সম্মান করার এবং শত্রুবাহিনীর যেসব যুদ্ধবন্দীরা একবার অস্ত্র ত্যাগ করেছে, তাদের মানবিক মর্যাদাকে সম্মান করার মৌলিক মনোভাব থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। যারা এটাকে মৌলিক মনোভাবের প্রশ্ন বলে মনে করেন না বরং টেকনিক্যাল প্রশ্ন বলে মনে করেন, তারা বাস্তবিকই ভুল ভেবেছেন, তাঁদের মতামতকে সংশোধন করা দরকার। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** শ্রমজীবী জনগেণর মধ্যে কাজ করার সময় কমিউনিস্টদের অবশ্যই বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষাদানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং কোনো মতেই হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্য করার পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেওয়া হবে না। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমাদের কমরেডদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মতাদর্শগত পুনর্গঠন হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী, ধৈর্যশীল ও সূক্ষ্মকাজ, কয়েকটি মাত্র ক্লাস নিয়ে বা কয়েকটি সভা করে, জনগণের মতাদর্শকে যা কয়েক দশক বছর ধরে জীবনধারার ভেতর দিয়ে রূপ লাভ করেছে, তা পরিবর্তিত করার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত নয়। কাউকে বশে আনার জন্য শুধু তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়, চাপ দেওয়া চলে না। চাপ দেবার ফল সর্বদাই হচ্ছে বশ না মানা। মানুষকে বশ মানাতে হলে বলপ্রয়োগ করা চলবে না। শত্রুদের প্রতি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে, কিন্তু কমরেড ও বন্ধুদের প্রতি কোনো মতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলবে না। "প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ মার্চ , ১৯৫৭)

*** শত্রু ও আমাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করা প্রয়োজন, শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব গ্রহণ করে শত্রুর প্রতি যেমন আচরণ করা হয়, কমরেডদের প্রতি তেমন ব্যবহার করা উচিত হবে না। বুকভরা উৎসাহের সংগে জনগণের কার্য সুরক্ষিত করার এবং জনগণের চেতনাকে উন্নত করার মনোভাব নিয়ে কথা বলা দরকার, উপহাস কিংবা আক্রমণের মনোভাব নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। ঐ

সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক

*** সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী বলে মনে করেন। এই ধরনের সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে হবে অপরাজেয়... "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** প্রত্যেকটি কমরেডকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যদি আমরা জনগণের উপর নির্ভর করি, জনসাধারণের অফুরন্ত সৃজনী শক্তিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি আর এ কারণে জনগণের উপর আস্থা রেখে তাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাই, তাহলে যে কোনো বাধা-বিপত্তিকেই আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং কোনো শত্রুই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না, পরন্তু আমরাই তাদের দাবিয়ে রাখবো। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** আমাদের কমরেডরা যে কোনো স্থানেই যান না কেন, তাদের অবশ্যই জনসাধারণের যত্ন নিতে হবে এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করতে হবে। ব্যাপক জনগণের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যত বেশি জনগণের সঙ্গে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই ততই ভাল। "ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** মুক্ত এলাকায়, একদিকে সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই সরকারকে সমর্থন করতে হবে ও জনগণকে ভালবাসতে হবে, অপর দিকে সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই জনগণের নেতৃত্ব করতে হবে, এইভাবে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি ভাল হয়ে উঠবে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** সৈন্যবাহিনীতে প্রত্যেক কমান্ডার ও যোদ্ধাদের অবশ্যই মতাদর্শের ক্ষেত্রে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে হবে, যাতে করে তারা সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার গুরুত্বটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। যদি সৈন্যবাহিনী নিজেদের দিক থেকে এই কাজ ভালভাবে করে, তাহলে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় পার্টি সংগঠন, স্থানীয় সরকারী

সংস্থা ও জনগণ তাদের সম্পর্ক আরও উন্নত করতে পারবেন। "মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

*** সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার এবং সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার আন্দোলনে সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের পক্ষ থেকে এবং পার্টি ও সরকারকেও তাদের পক্ষ থেকে ১৯৪৩ সালের ভুল-ত্রুটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা উচিত এবং ১৯৪৪ সালে দৃঢ়ভাবে সেগুলো শুদ্ধ করা উচিত। এখন থেকে প্রতি চন্দ্র বছরের প্রথম মাসে এ ধরনের আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে এবং সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার প্রতিজ্ঞাপত্র বারবার ঘোষণা করতে হবে। ঘাঁটি এলাকায় পার্টি, সরকার ও জনগণের প্রতি সৈন্যবাহিনী উদ্ধত ব্যবহার করেছিল এবং পার্টি, সরকার ও জনগণের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর প্রতি যত্নের অভাব ঘটেছিল, এইসব ভুল-ত্রুটির জন্য ব্যাপক এবং খোলাখুলিভাবে বারবার আত্মসমালোচনা করতে হবে (প্রত্যেক পক্ষ শুধু নিজেদের সমালোচনাই করবেন, অপর পক্ষের সমালোচনা নয়) এবং ভুল-ত্রুটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করতে হবে। "ঘাঁটি এলাকায় খাজনা কমিয়ে দেবার, উৎপাদন বৃদ্ধি করার এবং সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার আন্দোলন প্রসারিত করুন" (১ অক্টোবর, ১৯৪৩)

তিনটা ব্যাপকতর গণতন্ত্র

*** একটা নির্দিষ্ট মাত্রার গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে কার্যকরী করতে হবে, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক মারধোর, গালাগালের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া এবং অফিসার ও সৈনিকদের এক সঙ্গে সুখদুঃখের ভাগ নেওয়া। এটা করলেই, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য অর্জিত হবে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘ ও কঠোর যুদ্ধে আমরা যে টিকতে পারবো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** এত শোচনীয় বৈষয়িক অবস্থা ও ঘনঘন যুদ্ধ সত্ত্বেও যে লাল ফৌজ দৃঢ়ভাবে টিকতে সক্ষম, তার কারণ, পার্টির ভূমিকা ছাড়াও সৈন্যবাহিনীর ভেতরে পালন করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক নীতি। অফিসাররা সৈনিকদের মারধোর করেন না, অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়, সভা করার ও কথা বলার স্বাধীনতা সৈনিকদের আছে, অপ্রয়োজনীয় জটিল গতানুগতিক রীতি নীতিকে বাতিল করা হয়েছে এবং টাকা পয়সার হিসেব সকলের সামনে খোলা আছে।... চীনে জনগণের যেমন গণতন্ত্র দরকার তেমনি সৈন্যবাহিনীরও গণতন্ত্রের দরকার। সৈন্যবাহিনীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে দেবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। "চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫ নভেম্বর, ১৯২৮)

*** আমাদের সৈন্যবাহিনীর ভেতরে রাজনৈতিক কাজ করার নীতি হচ্ছে সৈনিকসাধারণ, কমান্ডার ও সমস্ত কর্মীকে সাহসের সঙ্গে জাগ্রত করা, কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বাধীন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনটা প্রধান লক্ষ্য—উচ্চ মাত্রার রাজনৈতিক ঐক্য, উন্নততর জীবনযাত্রার এবং সামরিক ক্ষেত্রে উন্নততর টেকনিক ও যুদ্ধকৌশল অর্জন করা। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলোতে বর্তমানে যে 'তিনটা যাচাই' ও 'তিনটা শুদ্ধি' উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরোক্ত এই তিনটা প্রধান লক্ষ্যের প্রথম দুটিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্জন করা।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যাপারে, কোম্পানির সরবরাহ ও খাবার ব্যবস্থা পরিচালনার বাজে কোম্পানির পরিচালকদেরকে সাহায্য করার জন্য

(কিন্তু তাঁদের ছাড়িয়ে যেতে নয়) সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকারটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে।

সামরিক গণতন্ত্রের ব্যাপারে, সৈন্যদের ট্রেনিংয়ের সময়ে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে এবং সৈনিকদের নিজেদের অবশ্যই পরস্পরকে শেখাতে হবে; আবার যুদ্ধের সময়ে ফ্রন্টে অবস্থিত কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সভা করবে। কি করে আক্রমণ করে শত্রুর অবস্থান দখল করে নেওয়া যায় এবং কি করে যুদ্ধের কর্তব্য পালন করা যায়, সেই আলোচনার জন্য কোম্পানির পরিচালকদের নেতৃত্বে সৈনিকসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। যুদ্ধ একটানা কয়েক দিন ধরে চললে, এ ধরনের কয়েকটি সভা করতে হবে। উত্তর সেনসীর ফানলুং যুদ্ধে এবং শানসী-ছাহার-হোপে এলাকার শিচাচুয়াংয়ের যুদ্ধে, এ ধরনের সামরিক গণতন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এতে প্রমাণ হয়েছে, সামরিক গণতন্ত্র শুধু উপকারই করে, কোনো ক্ষতি করে না। "সৈন্যবাহিনীর ভেতরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন" (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮)

*** বর্তমানের মহান সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে যে, গোটা পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলো, পার্টি সদস্য ও কেডারদের তাঁদের সক্রিয়তাকে পরিপূর্ণভাবে স্ফুরণ করা উচিত, শুধু এমনি করেই বিজয় লাভ করা যায়। এই সক্রিয়তার স্ফুরণ অবশ্যই বাস্তবভাবে প্রদর্শন করা উচিত। নেতৃস্থানীয় সংস্থা, কেডার ও পার্টি সদস্যদের সৃজনশীল ক্ষমতায়, দায়িত্বশীল মনোভাবে, কর্মে তাঁরা যে উচ্ছসিত উৎসাহ দেখান তাতে এবং প্রশ্ন উত্থাপন, মত প্রকাশ ও ত্রুটি সমালোচনায় তাদের সাহসে ও নৈপুণ্যে এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় কেডারদের প্রতি সস্নেহ তত্ত্বাবধানে। অন্যথায় তথাকথিত 'সক্রিয়তা' হয়ে পড়বে একটা ফাঁকা বুলি। কিন্তু এইরূপ সক্রিয়তার স্ফুরণ নির্ভর করে পার্টির অভ্যন্তরীণ জীবনের গণতান্ত্রিকীকরণের উপর। পার্টির ভেতরকার গণতান্ত্রিক জীবনের অভাবে এইরূপ সক্রিয়তার স্ফুরণ অসম্ভব। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক জীবনের মাধ্যমেই বিপুলসংখ্যক সক্ষম মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** সে যে কেউ হোক না কেন, শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি না হলে, কু-উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণ না চালালে, তাকে বলার অনুমতি দিতে হবে, ভুল বললেও কিছু আসে যায় না। সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরই অন্যদের কথা শোনার দায়িত্ব রয়েছে। দুটি নীতি অনুসরণ করতে হবে; (১)

যা জানেন বলুন, যদি বলেন, সবটাই বলুন; (২) বক্তাকে দোষ দেবেন না, তারা কথাকে সতর্কবাণী হিসেবে গ্রহণ করুন। বক্তাকে দোষ দেবেন না এই নীতিটাকে বাদ দিলে এবং সত্যিকারভাবে ও অকৃত্রিমভাবে একে অনুসরণ না করলে, যা জানেন বলুন, যদি বলেন, সবটাই বলুন'— এতে ফল হবে না। "১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

*** পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষার কাজ অবশ্যই চালাতে হবে, যাতে করে পার্টি-সদস্যরা বুঝতে পারেন, গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ কি, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যকার সম্পর্ক কি এবং কি ভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র এই উপায়েই, একদিকে পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবনকে সত্যি সত্যি প্রসারিত করা সম্ভব; অন্য দিকে উগ্র-গণতন্ত্র, শৃঙ্খলা লঙঘনকারী উদারনৈতিক স্বেচ্ছাচারীতাকে এড়ানো সম্ভব। 'জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান' (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** সৈন্যবাহিনী ও স্থানীয় সংস্থাগুলো— উভয় ক্ষেত্রেই পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে চালু রাখা উচিত শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করা এবং সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, তাদের দুর্বল করার জন্য নয়। ঐ

*** তত্ত্বের ক্ষেত্রে উগ্র গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করুন। প্রথম, এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, উগ্র গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে, পার্টি সংগঠনের ক্ষতি করা, এমনকি তার পুরোপুরি সর্বনাশ করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, এমনকি তার পুরোপুরি ধ্বংস সাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহন করতেও অক্ষম করে তোলা, এর ফলে, বিপ্লবের পরাজয় ডেকে আনা হয়। দ্বিতীয়, এটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, উগ্র গণতন্ত্রের উৎস রয়েছে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারনৈতিক উচ্ছলতায়। এটাকে পার্টির ভেতরে টানলেই, তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উগ্র গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ করে। সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধারা একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

শিক্ষা ও ট্রেনিং

*** আমাদের শিক্ষানীতি এমন হওয়া উচিত, যারা শিক্ষালাভ করেন, তাঁরা যাতে নৈতিকভাবে, বুদ্ধিগতভাবে এবং শারীরিকভাবে বিকাশলাভ করতে পারেন এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** কর্মরত বা কেডার স্কুলের শিক্ষারত কেডারদের শিক্ষা সম্পর্কে এমন একটা নীতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যাতে উক্ত শিক্ষা চীনা বিপ্লবের বাস্তব সমস্যার গবেষণাকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে নিশ্চল ও বিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করার পদ্ধতি ত্যাগ করে। "আমাদের শিক্ষা সংস্কার করুন" (মে, ১৯৪১)

*** একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে স্কুলের পরিচালক ও শিক্ষক বাছাই করা এবং একটা শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করা। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** কয়েকজন অথবা দশ-বিশজন লোক নিয়ে গঠিত নেতৃত্ব-মেরুদণ্ড না থাকলে, একশ' লোকের স্কুল নিশ্চয়ই ভালভাবে চালানো যায় না; এই নেতৃত্ব-মেরুদণ্ড গড়ে উঠে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (কৃত্রিমভাবে একত্র করে নয়), শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সক্রিয়, সৎ ও সুচতুর তাঁদের নিয়ে। "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১ জুন, ১৯৪৩)

*** আমাদের গোটা সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের অবশ্যই তাদের সামরিক কৌশলের উন্নতি করতে হবে, যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের উদ্দেশ্যে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত শত্রুকে দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে, সাফ করে, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। "চীনা গণমুক্তি ফৌজের ঘোষণা" (অক্টোবর, ১৯৪৭)

*** শুদ্ধিকরণ ও ট্রেনিংয়ের এক বছরের পরিকল্পনা বর্তমানে শুরু হয়েছে, এর মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক দুটি দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে, আর এ দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। শুরুতে গুরুত্ব

দিতে হবে রাজনৈতিক দিকে, অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্কের উন্নতির দিকে, অভ্যন্তরীণ ঐক্য দৃঢ় করার দিকে, আর কেডার ও সৈনিক সাধারণের সক্রিয়তাকে উচ্চমাত্রায় সঞ্চার করার দিকে, শুধুমাত্র এভাবেই সামরিক শুদ্ধিকরণ ও ট্রেনিং স্বচ্ছন্দে এগুতে পারে এবং আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে। "১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

*** সৈন্যদের ট্রেনিংয়ের পদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের ব্যাপক ট্রেনিং আন্দোলন চালানো উচিত, এ ট্রেনিংয়ে অফিসাররা সৈনিকদের শেখান, সৈনিকরা অফিসারদের শেখান এবং সৈনিকরা পরস্পরকে শেখান। "মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

*** সৈন্যদের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে আমাদের স্লোগান হচ্ছে, 'অফিসাররা সৈনিকদের শেখান, সৈনিকরা অফিসারদের শেখান এবং সৈনিকরা পরস্পরকে শেখান। যোদ্ধাদের অনেক বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। যোদ্ধাদের কাছ থেকে অফিসারদের শিখতে হবে, অন্যদের অভিজ্ঞতাকে নিজেদের করে নিলে তারা আরও বেশি দক্ষ হবেন। "শানসী-সুইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** সৈন্যদের ট্রেনিংয়ের কার্যক্রমের ব্যাপারে, এখনও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গুলিবর্ষণ, সংগীন চালনা, হাতবোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি টেকনিকের মান উন্নত করা, গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধকৌশলের মান উন্নত করা, আর নৈশযুদ্ধের অনুশীলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া। "মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

জনগণের সেবা

*** আমাদের বিনয়ী ও সতর্ক হতে হবে, অহংকার ও অসহিষ্ণুতার প্রতি সজাগ থাকতে হবে এবং মনেপ্রাণে চিনা জনগণের সেবা করতে হবে,.......। "চীনের দুটি ভাগ্য" (২৩ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** মনেপ্রাণে জনগণের সেবা করা, এক মুহূর্তের জন্য জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া; সব ব্যাপারই জনগণের স্বার্থ থেকে শুরু করা, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোনো ক্ষুদ্র চক্রের স্বার্থ থেকে নয়; জনগণের প্রতি দায়িত্বকে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার প্রতি আমাদের দায়িত্বের সঙ্গে এক করে মিশিয়ে ফেলা; এ সকলই হচ্ছে আমাদের কাজের প্রারম্ভিক বিন্দু। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর অবশ্যই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা চালু করতে হবে এবং জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে হবে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর কর্মীদের অবশ্যই জনগণের সেবা করতে হবে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** কমরেড বেথুন নিজের প্রতি লেশমাত্রও মনোযোগ না দিয়ে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন, তাঁর এই ভাব-মানস এটাই অভিব্যক্ত করে যে, তিনি কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন এবং কমরেড ও জনগণের সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক কমিউনিস্টদেরই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।...

আমাদের সবারই তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব-মানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই ভাব-মানস গ্রহণ করলে সকলেই জনগণের পক্ষে খুব হিতকর হবেন। একজন মানুষের যোগ্যতা বেশি অথবা কম হতে পারে, কিন্তু এই ভাব-মানস থাকলেই তিনি হতে পারেন মহাপ্রাণ লোক, প্রকৃত লোক, নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে মুক্ত লোক ও জনগণের জন্য হিতকর লোক। "নর্মান বেথুন স্মরণে" (২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

*** আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে জনগণের মুক্তির জন্য এবং পুরোপুরিই জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করে। "জনগণের সেবা" (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** আমাদের সমস্ত কেডার, তাঁদের পদ যত উঁচু বা নীচু হোক না কেন, সবাই হচ্ছেন জনগণের সেবক এবং যা কিছু আমরা করি, তা জনগণের সেবার জন্য করি, তাই আমাদের নিজেদের মধ্যে যা খারাপ, তা আমরা কেন ত্যাগ করতে পারবো না? "১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

*** আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। প্রতিটি কথা, প্রতিটি কার্যকলাপ, প্রতিটি নীতি সবই জনগণের স্বার্থের অনুকূল হওয়া উচিত, যদি ভুল হয়, তাহলে অবশ্যই তা সংশোধন করতে হবে, এটাকেই বলে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। "জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি" (১৩ আগস্ট, ১৯৪৫)

*** সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ দুর্দশা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে। তবে আমাদের অনাবশ্যক প্রাণদানের সংখ্যা কমানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত। "জনগণের সেবা" (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** মানুষের মৃত্যু অবশ্যই হয়, কিন্তু মৃত্যুর তাৎপর্য ভিন্ন। প্রাচীন চীনে শিমা ছিয়েন নামক একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, "মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তার তাৎপর্য হবে থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী বা বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা।" জনগণের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী; কিন্তু যে লোক ফ্যাসিস্টদের জন্য খাটে অথবা জনগণের শোষণকারী ও জনগণের অত্যাচারীদের জন্য মরে, তার মৃত্যু বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা। ঐ

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

*** একজন কমিউনিস্ট যিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়েই কি আবার দেশপ্রেমিক হতে পারেন? আমরা মনে করি, তিনি শুধু হতেই পারেন না, তাঁর হওয়া উচিত। দেশপ্রেমের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের ‘দেশপ্রেম আছে, আবার আমাদেরও দেশপ্রেম আছে। কমিউনিস্টদের অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের তথাকথিত দেশপ্রেমের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করতে হবে। তাদের দেশের দ্বারা চালিত যুদ্ধে জাপান ও জার্মানির কমিউনিস্টরা হচ্ছেন পরাজয়বাদী। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের পরাজয় ঘটানোই হচ্ছে জাপানী ও জার্মান জনগণের স্বার্থের অনুকূল; এই পরাজয় যতটা সম্পূর্ণ হয়, ততই ভাল।... কারণ, জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের দ্বারা চালিত যুদ্ধ কেবলমাত্র যে বিশ্বের জনগণের ক্ষতি করছে তা-ই নয় বরং তাদের নিজেদের দেশের জনগণেরও ক্ষতি করছে। চীনের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন, কারণ চীন হচ্ছে আক্রান্ত দেশ। অতএব, চীনা কমিউনিস্টদের অবশ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে দেশপ্রেমকে মিলিয়ে দিতে হবে। আমরা হচ্ছি আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়ে দেশপ্রেমিকও বটে, আমাদের স্লোগান হচ্ছে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আমাদের পক্ষে, পরাজয়বাদ হচ্ছে অপরাধ, জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয় লাভের চেষ্টা করাটা হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, কেবলমাত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেই আমরা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে পারি। আর কেবলমাত্র জাতীয় মুক্তি অর্জন করেই সর্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। চীনের বিজয় এবং চীনের উপর আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় অন্যান্য দেশের জনগণকে সাহায্য করবে। তাই দেশপ্রেম হচ্ছে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিকতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ। “জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান” (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** একজন বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে চীনা জনগণের মুক্তির কার্যকে নিজের বলে মনে করতেন, এটা কি ধরনের ভাব-মানস? এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাব-মানস, এটা হচ্ছে কমিউনিজমের

ভাব-মানস, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।... সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালী ও অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করা যাবে, আমাদের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্বের জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জন করা যাবে। এই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ—সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ যা দিয়ে আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশপ্রেমের বিরোধিতা করি। "নর্মান বেথুন স্মরণে" (২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

*** নিপীড়িত জনগণ পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম নির্ভর করেন তাঁদের নিজেদের সংগ্রামের উপর এবং শুধু তার পরেই আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর। যে জনগণ নিজেদের বিপ্লবে বিজয় লাভ করেছেন, তাদেরকে এখনও যারা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন এমন সব জনগণকে সাহায্য করতেই হবে। এটা হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব। "আফ্রিকান বন্ধুদের সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ" (৮ আগস্ট, ১৯৬৩)

*** সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাষ্ট্র। এগুলোতে শোষক শ্রেণিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং শ্রমজীবী জনগণ ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। এই দেশগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদকে এক করে নেবার নীতি পালন করা হচ্ছে। একই স্বার্থ, একই আদর্শ আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। "মহান অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিভিন্ন দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, সমস্ত শান্তিকামী দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, আমেরিকার দ্বারা আক্রান্ত, নিয়ন্ত্রিত, হস্তক্ষেপাধীন ও লাঞ্ছিত সমস্ত দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণনীতি ও যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা উচিত। "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পানামার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দেশপ্রেমমূলক সংগ্রামের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (১২ জানুয়ারি, ১৯৬৪)

*** বস্তু অবিরাম বিকাশ লাভ করে। ১৯১১ সালের বিপ্লব, অর্থাৎ সিনহায় বিপ্লব থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র ৪৫ বছর অতীত হয়েছে, এর মধ্যেই চীনের চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। আরও ৪৫ বছর কেটে গেলে, অর্থাৎ ২০০১ সালে অথবা একুশ শতকের শুরুতে চীনের চেহারার আরও বেশি পরিবর্তন ঘটবে। চীন হয়ে উঠবে একটা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রধান দেশ। চীনের অবশ্যই এমনি হওয়া উচিত। কারণ, চীন হচ্ছে এমন একটা দেশ যার আয়তন ৯,৬০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আর যার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৬০ কোটি, মানবজাতির প্রতি চীনের অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বিরাট অবদান থাকা উচিত। কিন্তু অতীতে দীর্ঘকাল ধরে তার এই ধরনের অবদান খুবই কম ছিল। এর জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমাদের অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে। শুধু এখনই নয়, এমনকি ৪৫ বছর পরেও, সর্বদাই আমাদের বিনয়ী থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, চীনা লোকদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে সাফ করে, সম্পূর্ণরূপে বৃহৎ রাষ্ট্রবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। "ডাক্তার সান ইয়াৎ সেনের স্মরণে" (নভেম্বর, ১৯৫৬)

*** আমাদের কোনোক্রমেই বৃহৎ রাষ্ট্রবাদের দাম্ভিক মনোভাব রাখা উচিত নয়, বিপ্লবের জয়লাভ ও দেশ গঠন কার্যে কিছু সাফল্য অর্জনের কারণে অহঙ্কার ও আত্মগর্ব করা কোনো মতেই উচিত নয়। প্রত্যেকটি দেশ, সে ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, তার সদগুণ ও অসদগুণ আছে। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

বিপ্লবী বীরত্ব

*** এই সৈন্যবাহিনীর আছে অদম্য মনোবল, সমস্ত শত্রুকে পদানত রাখতে এই বাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই বাহিনী কোনোক্রমেই শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করবে না। বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট যাই হোক না কেন, একজন মাত্র লোক অবশিষ্ট থাকলেও সে লড়াই করে যাবে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** বীরত্বপূর্ণভাবে যুদ্ধ করা, আত্মবলিদানের ভয় না করা, ক্লান্তির ভয় না করা ও ক্রমাগত লড়াই করার (অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা কয়েকটা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার) রীতি সম্প্রসারিত করা। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

*** আমাদের সামনে হাজার হাজার শহীদ বীরত্বের সঙ্গে জনগণের স্বার্থে প্রাণ বলি দিয়েছেন। তাঁদের সে পতাকা উর্ধ্বে তুলে আসুন, আমরা এগিয়ে চলি তাদের রক্ত চিহ্ন বেয়ে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন, আত্মবলিদানে নির্ভয় হোন, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করুন, বিজয় অর্জন করুন। "বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন" (১১ জুন, ১৯৪৫)

*** ....উত্তর অভিযানের অগ্রগতির জরুরী মুহূর্তে, কুওমিনতাং কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসঘাতী, গণবিরোধী 'পার্টি সাফাই' নীতি এবং গণহত্যার নীতিই কুওমিনতাং, কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন স্তরের জনগণের জাতীয় যুক্তফ্রন্ট— যে যুক্তফ্রন্ট চীনা জনগণের মুক্তি কার্যের প্রতিনিধিত্ব করছিল, তার ও তার সকল বিপ্লবী নীতির সর্বনাশ করলো।... এর পরে ঐক্যের জায়গায় এলো গৃহযুদ্ধ, গণতন্ত্রের আসনে এলো স্বৈরাচারী একনায়কত্ব আর সুউজ্জ্বল চীনকে গ্রাস করলো অন্ধকার চীন। কিন্তু এটা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে পারেনি, বশে আনতে পারেনি, নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। তারা ভূপতিত অবস্থা থেকে উঠে শরীরের রক্ত চিহ্ন মুছে ফেলে, নিহত কমরেডদের সমাধিস্থ করে, আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংগ্রামে। বিপ্লবের মহান পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সশস্ত্র প্রতিরোধে জেগে উঠলেন তাঁরা, আর চীনের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন জনগণের সরকার, ভূমি ব্যবস্থার করলেন সংস্কার, গড়ে তুললেন

একটা গণফৌজ— চীনা লাল ফৌজ, আর সংরক্ষিত ও প্রসারিত করলেন চীনা জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** আপনাদের বহু সদগুণ আছে এবং বিরাট অবদান আছে, কিন্তু অহঙ্কার করবেন না— এ কথাটা অবশ্যই মনে রাখবেন। সবাই আপনাদের সম্মান করেন— এটা ঠিক, কিন্তু এটা আপনাদেরকে সহজেই অহঙ্কারী করে তোলে। আপনারা যদি অহঙ্কারী হয়ে উঠেন, যদি বিনয়ী না হোন, আর সচেষ্ট না হোন এবং অন্যদের সম্মান না করেন, কেডারদের ও জনসাধারণকে সম্মান না করেন, তাহলে আপনারা বীর ও আদর্শ হতে পারবেন না। অতীতে কিছু লোক এরকম ছিল, আশা করি আপনারা তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না। "অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ জানুয়ারি, ১৯৪৫)

*** শত্রুকে ধ্বংস করার এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ সাধনের সংগ্রামে আপনারা বহু বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করেছেন, প্রভূত সাহস, বুদ্ধি ও সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। গোটা চীনা জাতির সামনে আপনারা হলেন আদর্শ, সর্বক্ষেত্রে জনগণের কার্যকে বিজয়ী অগ্রগতিতে ঠেলে দেবার আপনারাই হলেন মেরুদণ্ড, গণসরকারের আপনারাই হলেন নির্ভরযোগ্য সমর্থনস্তম্ভ আর গণসরকার ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে আপনারাই হলেন সংযোগকারী সেতু। "নিখিল চীনের রণবীর ও আদর্শ শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি সভায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন বাণী" (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)

*** শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার মনোবল, আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে হারানো ভূমি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প এবং বিশ্বজাতির অরণ্যে নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের চীনা জাতির আছে। "জাপানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি সম্পর্কে" (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন

*** সমস্ত কেডার ও জনগণ সর্বদাই যেন স্মরণ রাখেন যে, আমাদের দেশ একটা বিরাট সমাজতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র; এটা একটা বিরাট দ্বন্দ্ব। আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য কয়েক দশকের কঠোর সংগ্রামের প্রয়োজন, এর মধ্যে রয়েছে কঠোর মিতব্যয়ের প্রয়াস এবং অপচয়ের বিরোধিতা করার প্রয়াস, অর্থাৎ অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন করার নীতি অনসুরণ করা। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** কারখানা ও দোকান, সমস্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কার্য, সমবায় কার্য ও অন্যান্য কার্য অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে; যে কোনো কাজেই অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার নীতি পালন করা উচিত। এটাই হচ্ছে মিতব্যয়ের নীতি, মিতব্যয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক নীতি। চীন হচেছ একটা বিরাট দেশ, কিন্তু এখনও খুব দরিদ্র, চীনকে সমৃদ্ধ করতে কয়েক দশক লাগবে। কয়েক দশক পরেও অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার নীতি পালন করা প্রয়োজন, কিন্তু আগত কয়েক দশকে, বর্তমানের কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে, বিশেষ করে অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সপক্ষে প্রচার করা এবং মিতব্যয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। "অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সমবায় সমিতির চালনা-এর ভূমিকালিপি" (১৯৫৫)

*** যে কোনো স্থানেই হোক না কেন, জনশক্তি ও বস্তুসম্পদকে অত্যন্ত কদর করতে হবে। সাময়িক স্বার্থের জন্য অপব্যয় ও অপচয় করা কোনোক্রমেই চলবে না। যে কোনো স্থানে কার্যারম্ভের প্রথম বছর থেকেই ধরে নিতে হবে যে, কাজটা ভবিষ্যতে বহু বছর চলবে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে এবং শত্রু বিতাড়িত করার পরে গঠন কাজ শুরু করতে হবে। একদিকে কোনো মতেই অপব্যয়ী ও অপচয়ী হওয়া উচিত নয়, অপরদিকে সক্রিয়ভাবে উৎপাদন বাড়ানো উচিত। অতীতে কোনো কোনো জায়গায় লোকজন দূরদৃষ্টি গ্রহণ করেননি, জনশক্তি ও বস্তুসম্পদের মিতব্যয়ে মযোযোগ দেননি, উৎপাদনের সম্প্রসারণে অবহেলা করেছেন, ফলে বিরাট

লোকসান ভোগ করেছেন। এই শিক্ষার দিকে এখন অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। "অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ জানুয়ারী, ১৯৪৫)

*** কৃষি উৎপাদন ও শহরে-নগরে শিল্প উৎপাদনের দ্রুত পুনরুদ্ধার ও বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ করার সংগ্রামে সমস্ত উৎপাদন উপকরণ ও সমস্ত জীবিকার উপায় যা ব্যবহার করা যায়, তা সর্বাধিক পরিমাণে সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে, আর যে কোনো লোক তা নষ্ট ও অপচয় করে, তার বিরুদ্ধে এবং বেপরোয়য়া পান-ভোজের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, মিতব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। "শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** আর্থিক খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ের নীতি অনুসরণ করা উচিত। সমস্ত সরকারি কর্মীদের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, দুর্নীতি ও অপচয় অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। দুর্নীতি ও অপচয়বিরোধী সংগ্রামে ইতিমধ্যেই কিছু ফল পাওয়া গেছে, পরে আরও চেষ্টা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্য, বিপ্লবী কার্যের জন্য এবং অর্থনৈতিক গঠন কার্যের জন্য প্রতিটি পয়সা বাঁচানোই হচ্ছে আমাদের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার নীতি। "আমাদের অর্থনৈতিক নীতি" (২৩ জানুয়ারী, ১৯৩৪)

*** জনসাধারণের সঙ্গে একত্রে সুখদুঃখের ভাগ নেবার অনিচ্ছা এবং ব্যক্তিগত খ্যাতি ও লাভের জন্য মাথা ঘামানোর একটা বিপদজনক ঝোঁক সম্প্রতি আমাদের কর্মীদের অনেকের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে, এটা খুবই খারাপ। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মিতব্যয়ের আন্দোলনে আমাদের সংস্থাগুলোকে সহজতর করা এবং কেডারদেরকে নিম্নতর স্তরে প্রেরণ করা, যাতে বেশ কিছু সংখ্যক কেডার উৎপাদন কাজে ফিরে যেতে পারেন, এটা হচ্ছে এই ধরনের বিপদজনক ঝোক দূর করার একটা উপায়। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** নিজের ভরণপোষণের জন্য সৈন্যবাহিনীর উৎপাদন, জীবনযাত্রাকে উন্নত ও জনগণের বোঝা হালকা করেছে, এইভাবে সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে, শুধু তাই নয়, তাছাড়া এটা অবিলম্বে অনেক পার্শ্বদ্রব্যও এনেছে। সেগুলো হচ্ছে:

(১) অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি। অফিসার ও সৈনিকরা এক সঙ্গে উৎপাদন ও পরিশ্রম করে ভ্রাতৃসুলভ হয়ে উঠেছেন।

(২) শ্রমআগ্রহ দৃঢ়তর করা।... নিজেদের ভরণপোষণের জন উৎপাদন শুরুর পর থেকে শ্রমআগ্রহ দৃঢ় হয়েছে এবং ভবঘুরে নিষ্কমণ্যতা দূর করা গেছে।

(৩) শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করা। উৎপাদনের কাজে শ্রমশৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয়; এটা যুদ্ধের শৃঙ্খলা ও সৈন্য জীবনের শৃঙ্খলাকে শিথিল করেনি বরং এগুলোকে দৃঢ়তর করেছে।

(৪) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি। সৈন্যবাহিনীর নিজেদের গৃহস্থালি থাকলে জনসাধারণের সম্পত্তির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ কদাচিৎ ঘটে অথবা আদৌ ঘটে না। উৎপাদনের কাজে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ শ্রম বিনিময় করে পরস্পরকে সাহায্য করেন, ফলে তাদের মধ্যকার মৈত্রী সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হয়।

(৫) সরকারের সম্বন্ধে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষ কমে গেছে এবং দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো হয়েছে।

(৬) জনগণের মহান উৎপাদন আন্দোলনের প্রেরণা। সৈন্যবাহিনী একবার উৎপাদনে লেগে গেলে সরকারি অফিস সংস্থাগুলোর উৎপাদনের কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তারা আরও বেশি সক্রিয়ভাবে কাজ করে; সমগ্র জনগণের সর্বজনীন উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে, আরও বেশি উদ্যমের সঙ্গে একে চালিয়ে নেওয়া হয়। “নিজেদের ভরণপোষণের জন্য সৈন্যবাহিনীর উৎপাদন সম্পর্কে এবং রীতির শুদ্ধিকরণ ও উৎপাদনের দুটি মহান আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে” (২৭ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** কেউ কেউ বলেন, সৈন্যবাহিনী উৎপাদনের কাজে যোগ দিলে সে যুদ্ধ করতে ও ট্রেনিং নিতে পারবে না; অফিস সংস্থাগুলো উৎপাদন করলে তারাও নিজস্ব কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এ কথা ভুল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্ত এলাকার সৈন্যবাহিনী বিরাট পরিমাণের উৎপাদনের কাজ হাতে নিয়ে নিজেদের খাদ্য ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করেছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের ট্রেনিং চালিয়েছে এবং

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পড়াশুনা চালিয়েছে। এসব আগের থেকে অধিক সাফল্য অর্জন করেছে, সৈন্যবাহিনীর ভেতরকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যও আগের থেকে আরও দৃঢ়তর হয়েছে। ফ্রন্ট এলাকায়, গত বছর বিরাটাকারের উৎপাদন আন্দোলন চালানো হয়েছিল, আর গত বছর যুদ্ধেও বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে সৈন্যদের ট্রেনিং আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উৎপাদনের কারণে অফিস সংস্থাগুলোর কর্মচারীদের জীবনের মান আরও উন্নত হয়েছে এবং আরও নিশ্চিন্ত মনে, আরও ফলপ্রসূভাবে তারা কাজ করেছেন। সীমান্ত ও ফ্রন্ট এলাকা, উভয় স্থানেই এই অবস্থা। "অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ জানুয়ারি, ১৯৪৫)

আত্মনির্ভরতা ও কঠোর সংগ্রাম

*** কোন ভিত্তির উপরে আমাদের নীতি স্থাপিত হওয়া উচিত? নিজেদের শক্তির ভিত্তিতে, এটাকেই আত্মনির্ভরতা বলা হয়। আমরা বিচ্ছিন্ন নই, দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশ ও জনগণই হচ্ছেন আমাদের বন্ধু। কিন্তু আমরা আত্মনির্ভরতার উপরেই জোর দিই, নিজেদের সংগঠিত শক্তির উপরে নির্ভর করে আমরা সমস্ত চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করতে পারি। "জাপানবিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের নীতি" (১৩ আগস্ট, ১৯৪৫)

*** আমরা আত্মনির্ভরতার পক্ষে। আমরা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করি, কিন্তু তার উপর আমরা নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারি না, আমরা নিজেদের প্রচেষ্টার এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সৃজনী শক্তির উপরেই নির্ভর করে থাকি। "অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ জানুয়ারি, ১৯৪৫)

*** দেশব্যাপী বিজয়লাভ করাটা হচ্ছে দশ হাজার লি দীর্ঘ অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।... চীনা বিপ্লব মহান, কিন্তু বিপ্লবের পরের পথ হবে আরও দীর্ঘতর, কাজটা হবে আরও মহান এবং আরও কঠোর। পার্টিতে এ কথাটা এখন অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে, যাতে কমরেডরা বিনয়ী ও সতর্ক হবার রীতিকে, অহঙ্কার ও অসহিষ্ণুতার প্রতি সজাগ থাকার রীতিকে এবং কঠোর সংগ্রামের রীতিকে বজায় রেখে চলেন। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** কঠোর সংগ্রাম ছাড়া, ঘাম ও রক্তপাত ছাড়া সৌভাগ্যবশত সহজে বিজয় লাভের যে সমস্ত ধারণা আমাদের কেডারদের মধ্যে রয়েছে তা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে সাফ করে ফেলতে হবে। "উত্তর-পূর্বে সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলুন" (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

*** আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্ব-অগ্রগতির অবস্থা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সর্বদা প্রচার চালাতে হবে, যাতে বিজয়ের উপর জনগণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন। একই সময়ে জনগণ এবং কমরেডদেরকে আমাদের বলে দিতে হবে যে, এই পথ হচ্ছে আঁকাবাঁকা। বিপ্লবের পথে আরও অনেক বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে অনুমান করা হয়েছিল যে, আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, কারণ আমরা বাধা-বিপত্তিকে আরও

বেশি করে ভাবতে পছন্দ করি। আমাদের কোনো কোনো কমরেড কষ্টকে বেশি করে ভাবতে চান না। কিন্তু কষ্টটা হচ্ছে বাস্তব, কষ্ট যতই থাক, ততই তা স্বীকার করতে হবে, 'অস্বীকারের নীতি' অবলম্বন করলে চলবে না। আমাদের কষ্টকে স্বীকার করতে হবে, তার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। পৃথিবীতে কোথাও সোজা পথ নেই, আঁকাবাঁকা পথে চলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, কখনও সস্তায় কোনো কিছু লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা মনে করা উচিত নয় যে, কোনো এক সুন্দর ভোরে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বেচ্ছায় হাঁটু গেড়ে বসবে। এক কথায়, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কিন্তু পথটা আঁকাবাঁকা। আমাদের সামনে বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে, যা আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমরা সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় অবশ্যই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে ও বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবো। "ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** যারা শুধুমাত্র উজ্জ্বল দিকটা দেখেন, কষ্টকর দিকটা দেখেন না, তাঁরা পার্টির কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন না। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** সমাজের সম্পদকে শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরাই সৃষ্টি করেন। যদি তাঁরা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন অনুসরণ করেন, সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে নয় বরং সক্রিয় মনোভাব নিয়ে তা সমাধান করেন, তাহলে পৃথিবীর যে কোনো বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবেন। "পার্টি সম্পাদক কাজে হাত লাগান, সমগ্র পার্টি সমবায় সমিতি গঠনের কাজ করে"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** গোটা পার্টির কমরেডদের অবশ্যই এসব কিছু পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং অদম্য মনোবলের সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও আমাদের উভয়ের সামনেই বাধা-বিপত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা অসম্ভব। কারণ, তারা মৃতপ্রায়, তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করা যেতে পারে, কারণ আমরা নবপ্রকাশমান শক্তি, আর আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। "চীনা বিপ্লবের নতুন উত্তাল জোয়ারকে স্বাগত জানান" (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)

*** আমাদের কমরেডদের কষ্টের সময়ে অবশ্যই সাফল্য ও ঔজ্জ্বল্যকে দেখতে হবে এবং আমাদের সাহস বাড়াতে হবে। “জনগণের সেবা করুন” (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** যে কোনো নতুন জিনিসকে বিকাশের সময়ে সর্বদাই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এঁকেবেঁকে চলতে হয়। বাধা-বিপত্তি ও আঁকাবাঁকা পথ ছাড়া এবং খুব বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়া, সমাজতান্ত্রিক কার্যে সর্বদাই পালের অনুকূল বাতাসে অগ্রসর হবার মতো সহজে সাফল্য লাভ করা যায় এমন মনে করাটা শুধু কল্পনামাত্র। “জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** বিপ্লবী সংগ্রামে কোনো কোনো সময়ে অনুকূল অবস্থার থেকে বাধা-বিপত্তিই বেশি জোরদার হয়ে উঠে, এই সময়ে বাধা-বিপত্তি হচ্ছে দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়াসের মাধ্যমে বাধা-বিপত্তিকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করা সম্ভব, নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাও সম্ভব, এমনি করে প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল অবস্থার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়। “দ্বন্দ্ব সম্পর্কে” (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** কাজ কাকে বলে? কাজই হচ্ছে সংগ্রাম। ঐ সব স্থানে রয়েছে বাধা-বিপত্তি আর সমস্যা, সেগুলোকে আমাদের সমাধান করতে হবে। আমরা বাধা-বিপত্তিগুলোকে সমাধান করার জন্যই সেখানে কাজ করতে ও সংগ্রাম করতে যাই। যেখানে যত বেশি বাধা-বিপত্তি সেখানে যেতে ততই বেশি আগ্রহশীল, শুধু এই ধরনের লোকেই হচ্ছেন ভাল কমরেড। “ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে” (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** একটা প্রাচীন চীনা উপকথা আছে, তার নাম ‘বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন’। এ উপকথায় প্রাচীন কালের এক বুড়োর কাহিনী বলা হয়েছে, তিনি বাস করতেন উত্তর চীনে। উত্তর পাহাড়ের বোকা বুড়ো নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়িটার দক্ষিণে ছিল দুটি উচ্চ পাহাড়, একটার নাম থাইহাং, অন্যটার নাম ওয়াংউ। এই দুটি পাহাড় তার বাইরে যাবার পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এই পাহাড় দুটিকে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে উপড়ে ফেলবার জন্য তাঁর ছেলেদের নিয়ে গেলেন। আর একজন বুড়ো, জ্ঞানী নামে তিনি পরিচিত এদের দেখে উপহাস করে বললেন, “তোমরা কী বোকার মতোই না কাজ করছো! এই বিরাট পাহাড় দুটিকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলা তোমাদের পিতাপুত্র ক’জনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।” বোকা বুড়ো জবাব দিলেন, “আমি মরলে আমার

ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে, তারা যখন মরবে তখন থাকবে আমার নাতিরা, আর তার পরে তাদের ছেলেরা ও নাতিরা। এমনি চলবে অনন্ত কাল ধরে। পাহাড় দুটি অনেক উঁচু, কিন্তু আর তারা উঁচু হতে পারবে না। আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব, ততটুকুই তারা নীচু হবে। তাহলে কেন আমারা তাদের খুঁড়ে সমান করতে পারবো না?” জ্ঞানী বুড়োর ভুল অভিমতটা খণ্ডন করে তিনি অবিচল বিশ্বাসের সাথে প্রতিদিন খুঁড়তে থাকলেন। এই দেখে ভগবান মুগ্ধ হলেন, তিনি দুজন দেবদূতকে পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। তাঁরা এসে পাহাড় দুটিকে পিঠে করে নিয়ে চলে গেলেন। আজ চীনা জনগণের মাথার উপরেও দুটি প্রকাণ্ড পাহাড় চেপে আছে। একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যটা সামন্তবাদ। এ দুটিকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলার জন্য অনেকদিন আগেই মনস্থির করেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং কাজ করতে হবে বিরামহীনভাবে, আমরাও তখন ভগবানের মন গলাতে পারবো। আমাদের ভগবান কিন্তু চীনা জনসাধারণ ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা যদি একযোগে উঠে দাঁড়ান এবং আমাদের সঙ্গে মিলে খুঁড়তে থাকেন, তাহলে এই দুটি পাহাড়কে উপড়ে ফেলা যাবে না কেন? “যে বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন” (১১ জুন, ১৯৪৫)

চিন্তাধারার পদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি

*** মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে অনিবার্যতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে অবিরাম বিকাশ লাভের একটা ইতিহাস। এই প্রক্রিয়া কখনো শেষ হবে না। যে সমাজে শ্রেণি বিদ্যমান, সেখানে শ্রেণি সংগ্রাম শেষ হবে না। শ্রেণিহীন সমাজে নূতন ও পুরাতনের, নির্ভুল ও ভুলের মধ্যেকার সংগ্রাম কোনো দিনই শেষ হবে না। উৎপাদন সংগ্রামের ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আওতায়, মানবজাতি অবিরাম বিকাশ লাভ করে, আর প্রকৃতিও নিরন্তর বিকাশ লাভ করে, এই প্রক্রিয়া কখনো একই স্তরে নিশ্চল থাকে না। অতএব, মানবজাতিকে অবিরামভাবে অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে হয়, আর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করতে হয়, সৃষ্টি ও অগ্রগতি সাধন করতে হয়। নিশ্চলতা, হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অহংকার ও আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ সবই ভুল। তারা ভুল, কারণ প্রায় এক মিলিয়ন বছর ধরে মানবজাতির সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে তারা সংগতি রাখে না এবং সংগতি রাখে না অদ্যাবধি আমাদের জানা প্রকৃতির (ধরা যাক, আকাশ মন্ডলের ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, জীব বিদ্যার ইতিহাস ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিফলিত প্রকৃতির) ঐতিহাসিক ঘটনার সংগে। "তৃতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই প্রদত্ত রিপোর্ট" থেকে উদ্‌ধৃত (২১-২২ ডিসেম্বর , ১৯৬৪)

*** প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানুষের একটা অস্ত্র। সমাজে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই সামাজিক বিজ্ঞানের দ্বারা সমাজকে উপলব্ধি করতে হবে, তাকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং সামাজিক বিপ্লব চালাতে হবে। প্রাকৃতিক জগতে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতিকে জানতে হবে, তাকে বশে আনতে হবে ও তার রূপান্তর সাধন করতে হবে এবং এমনি করে প্রকৃতির থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। "সীমান্ত এলাকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা সোসাইটির উদ্বোধনী সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০)

*** মার্কসবাদী দর্শন— দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদের দুটি স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য; একটা হচ্ছে তার শ্রেণী প্রকৃতি, এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদ সর্বহারা শ্রেণির সেবা করে, অপরটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রকৃতি, তত্ত্ব অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে অনুশীলন, আবার তত্ত্ব

অনুশীলনের সেবা করে এ সবের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। "অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

*** মার্কসবাদী দর্শনের মতানুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বাস্তব জগতের নিয়মবিধি বুঝার ফলে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে পারাটাই নয়, বরং বাস্তব নিয়ম-বিধির জ্ঞানের দ্বারা জগৎকে সক্রিয়তার সঙ্গে বদলানো। ঐ

*** মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে? সেগুলো কি আকাশ থেকে পড়ে? না সেগুলো কি নিজের মনের মধ্যে সহজাত?— না। মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কেবলমাত্র সামাজিক অনুশীলন থেকেই আসে, সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা— এই তিনটা অনুশীলন থেকে সেগুলো আসে। "মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে?" (মে, ১৯৬৩)

*** মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব তার চিন্তাধারাকে নির্ধারিত করে। অগ্রগামী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী নির্ভুল চিন্তাধারাকে জনসাধারণ একবার আয়ত্ত করে নিতে পারলেই এই চিন্তাধারা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়, যা সমাজকে পুনর্গঠন করে এবং দুনিয়াকে রূপান্তরিত করে। ঐ

*** মানুষ তাদের সামাজিক অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করে – সফলতার অভিজ্ঞতা এবং বিফলতার অভিজ্ঞতা, উভয়ই। বাস্তবমুখী বহির্জগতের অসংখ্য ঘটনা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়। প্রারম্ভে এটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান। যখন এই ধরনের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয় তখন একটা দ্রুত অতিক্রমণ ঘটে আর তা ধারনাত্মক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয় – এটাই হচ্ছে চিন্তাধারা। এটা হচ্ছে জ্ঞানের একটা প্রক্রিয়া। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের গোটা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ বাস্তব বস্তু থেকে আত্মমুখী চেতনায়, অস্তিত্ব থেকে চিন্তাধারায় চালিত হবার পর্যায়। এই পর্যায়ের চেতনা, চিন্তাধারা (তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, পদ্ধতিসহ) বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মগুলোকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে কি না তা এখনো প্রমাণিত হয়নি, সেগুলো নির্ভুল বা ভুল, তা নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব নয়। তারপর আসে জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ চেতনা থেকে বস্তুতে, চিন্তাধারা থেকে অস্তিত্বে চালিত হবার পর্যায়; এই পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ের অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয় এবং তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে কি না, তা অবলোকন করা

যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যা সফল হয় তা নির্ভুল, আর যা ব্যর্থ হয় তা ভুল; বিশেষ করে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে এটা সত্য। সামাজিক সংগ্রামে অগ্রগামী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিগুলো কখনো কখনো পরাজিত হয়; তাদের পরাজয়ের কারণ এ নয় যে তাদের চিন্তাধারা ভুল, বরং তার কারণ এই যে সংগ্রামরত শক্তিগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যতটা শক্তিশালী, অগ্রগামী শক্তিগুলো আপাতত ততটা শক্তিশালী নয়; তাই তারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়, কিন্তু একদিন না একদিন তারা জয়ী হতে বাধ্য। অনুশীলনের পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের আর একটা দ্রুত-অতিক্রমণ ঘটে। এই দ্রুত-অতিক্রমণের গুরুত্ব পূর্বেরটির চেয়ে বেশি। কারণ, কেবলমাত্র এই দ্রুত-অতিক্রমণই জ্ঞানের প্রথম দ্রুত-অতিক্রমণের ভ্রান্তি অথবা অভ্রান্তিকে, অর্থাৎ বাস্তবমুখী বহির্জগতের প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় অর্জিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, ও পদ্ধতি ইত্যাদির ভ্রান্তি অথবা অভ্রান্তিকে–প্রমাণ করতে পারে। সত্যকে যাচাই করার এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ঐ

*** একটা নির্ভুল জ্ঞান প্রায়শই বস্তু থেকে চেতনায় এবং চেতনা থেকে বস্তুতে, অর্থাৎ অনুশীলন থেকে জ্ঞানে এবং জ্ঞান থেকে অনুশীলনে অনেকবার পুনরাবৃত্তির পরেই কেবল আয়ত্ত করা যায়। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব। ঐ

*** কেউ কোনো বস্তুকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থাৎ সে বস্তুর পরিবেশে বাস করা (অনুশীলন করা) ছাড়া, আর কোনো উপায় নেই।… যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান, তাহলে বাস্তবকে পরিবর্তন করার অনুশীলনে আপনাকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি আপনি নাশপাতির স্বাদ জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ নিজের মুখে খেতে হবে।… যদি আপনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)

*** অনুশীলন থেকে জ্ঞান আরম্ভ হয়, অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই অনুশীলনে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তাই নয়, বরং আরও বেশি

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে বিপ্লবী অনুশীলনে দ্রুত অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়। ঐ

*** এটা সুবিদিত যে, যে কোনো কাজই করি না কেন, যদি তার অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তাহলে সে কাজের নিয়ম জানবো না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয়, তা জানবো না, তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারবো না। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

*** যদি কোনো মানুষ কাজে সাফল্য লাভ করতে চায়, অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল পেতে চায়, তাহলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মের উপযোগী করতে হবে, যদি তা উপযোগী না হয়, তাহলে অনুশীলনে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মানুষ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা লাভ করে এবং নিজের চিন্তাকে সংশোধন করে বহির্জগতের নিয়মের উপযোগী করে; তখন মানুষ তার বিফলতাকে সফলতায় পরিবর্তিত করতে পারে, 'বিফলতাই সফলতার জননী' এবং ঠেকবে যখন শিখবে তখন বলতে এটাই বুঝায়। "অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

*** আমরা মার্কসবাদী। মার্কসবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, কোনো সমস্যার বিচার করতে গেলে, বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে নয়, বরং বাস্তবে বিদ্যমান তথ্য থেকে শুরু করতে হবে, এ সব তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে কর্মনীতি, নীতি এবং উপায় খুঁজে বের করতে হবে। "সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

*** বাস্তব অবস্থা অনুসারে কর্মনীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক কর্মপদ্ধতি, যা সমস্ত কমিউনিস্টদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা যে ভুল করেছি তার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে, আমরা দেখতে পাই যে, আমরা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরে পড়ে আত্মগতভাবে নিজেদের কর্মনীতি নির্ধারণ করেছি। "শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১ এপ্রিল, ১৯৪৮)

*** দুনিয়ার ভাববাদ ও অধিবিদ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে অল্পায়াসের, কারণ এতে মানুষ যত খুশি আবোল তাবোল বকতে পারে, তাদের বাস্তবমুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হয় না এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায় পরীক্ষিতও হতে হয় না। অপরপক্ষে, বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের জন্য দরকার প্রয়াসের, তাদের বাস্তবমুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হবে এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায়

পরীক্ষিত হতে হবে, প্রয়াস না থাকলে ভাববাদ ও অধিবিদ্যার পক্ষে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। "হুফেং প্রতিবিপ্লবী চক্র সম্পর্কিত তথ্য" এর ভূমিকালিপি (মে, ১৯৫৫)

*** যখন আমরা কোনো বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার সারমর্মকে দেখতে হবে এবং তার বাহ্য রূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বারের দিশারী হিসেবে, আর প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করলেই সে বিষয়ের সারমর্মকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরতে হবে, এই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি। "একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাটাকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে" (৫ জানুয়ারি, ১৯৩০)

*** বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ বাহ্যিক নয় বরং অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এটা নিহিত। যে কোনো বস্তুর ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, অতএব, এটাই বস্তুর গতি ও বিকাশ উদ্রেক করে। বস্তুর ভেতরকার এ ধরনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কোনো একটা বস্তুর পারস্পরিক সংযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের গৌণ কারণ। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের শর্ত, অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি, অভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমে বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। উপযুক্ত তাপেই মুরগীর ডিম মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোনো তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত করতে পারে না, কারণ এ দুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন। ঐ

*** মার্কসবাদী দর্শনের মতে বিপরীতের একত্রে নিয়ম হচ্ছে বিশ্বের মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক জগতে, মানবসমাজে অথবা মানুষের চিন্তাধারায় সর্বত্রই এই নিয়ম কার্যকরী। দ্বন্দ্বের বিপরীত দিকগুলোর মধ্যে একত্ব ও সংগ্রাম উভয়ই আছে, আর এটাই বস্তুকে দেয় গতি ও পরিবর্তনের প্রেরণা। দ্বন্দ্ব সর্বত্রই থাকে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে দ্বন্দ্বগুলোর প্রকৃতিও বিভিন্ন। যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে বিপরীতের একত্ব হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক ও উত্তরণ সাপেক্ষ, তাই আপেক্ষিক, কিন্তু বিপরীতের সংগ্রামটা হচ্ছে চরম। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি। যাকে বিশ্লেষণ বলা হয়, তা হচ্ছে ব্যাপার বা বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। জীবন সম্পর্কে গভীর

জ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি না থাকলে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ অসম্ভব। “প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ” (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** লেনিন বলেছেন, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ হচ্ছে, ‘মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা’। বিশ্লেষণ করার মাথার অভাবে আমাদের বহু কমরেডই জটিল বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে চান না; পরন্তু একেবারেই হ্যা অথবা একেবারেই না– এমন সরল সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন।... এখন থেকে এ ধরনের অবস্থার প্রতিকার করা আমাদের উচিত। “অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি” (১২ এপ্রিল, ১৯৪৪)

*** এই কমরেডরা যে পদ্ধতিতে সমস্যাগুলো দেখেন, তা ঠিক নয়, সমস্যার সারবস্তু বা প্রধান দিকগুলোর উপরে তারা নজর দেন না; পরন্তু তারা জোর দেন অসারবস্তু বা অপ্রধান দিকগুলোর উপরে। এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই সব অসারবস্তুর সমস্যা বা অপ্রধান সমস্যাকে অবহেলা করা চলবে না এবং এক একটা করে তাদের সমাধান অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেগুলোকে সারবস্তু বা প্রধান দিক হিসেবে ধরা উচিত নয়, অন্যথায় আমরা দিশেহারা হবে। “কৃষি সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে” (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** পৃথিবীতে বিষয়গুলো জটিল, আর তা বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত। বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাগুলোকে দেখতে হবে, শুধুমাত্র একটা দিক থেকে দেখলে চলবে না। “ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে” (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** যারা আত্মগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখেন, শুধু তারাই একটা জায়গায় আসা মাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে (তার ইতিহাস ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে) বিবেচনা না করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার প্রকৃতি এবং তার ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সংযোগ) স্পর্শ না করেই আত্মগর্বের সঙ্গে হুকুম জারী করতে থাকেন, এ ধরনের লোক হোঁচট খেতে বাধ্য। “অনুশীলন সম্পর্কে” (জুলাই, ১৯৩৭)।

*** সমস্যার পর্যালোচনার ব্যাপারে অবশ্যই আত্মমুখীতা, একতরফা ও ভাসাভাসা ভাব ছাড়তে হবে। যাকে আত্মমুখীতা বলে, তার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে বাস্তবভাবে দেখতে না জানা, অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার

করে সমস্যাকে দেখতে না জানা। আমার অনুশীলন সম্পর্কে নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই বলেছি। একতরফতার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে সব দিক থেকে দেখতে না জানা।... অথবা বলা যায় যে, শুধু অংশ বিশেষকে দেখে, সমগ্রকে দেখে না; শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখে, অরণ্যকে দেখে না। এইভাবে দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, অসম্ভব অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অসম্ভব পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা। সামরিক ব্যাপার প্রসঙ্গে সুন উ-জু বলেছিলেন, "শত্রুকে জানুন, নিজেকে জানুন, তাহলে একশ বার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না"। তিনি যুদ্ধরত দুটি পক্ষের উল্লেখ করেছিলেন। থাং রাজবংশের আমলে উয়েই চেং যখন বলেছিলেন, "উভয় পক্ষকে শুনলে আলোকোজ্জ্বল হবেন, আর একপক্ষকে বিশ্বাস করলে আঁধারে ডুববেন।" তখন তিনিও একতরফার ভুল ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা প্রায়শই একতরফাভাবে সমস্যা দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন।... লেনিন বলেন, "কোনো বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, তার সব সংযোগ ও 'মধ্যস্থতাকে' আঁকড়ে ধরতে হবে, পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো দিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করবো না; কিন্তু সর্বতোমুখীতা দাবি করতে হবে, কারণ এটা আমাদেরকে ভুল ও জমাটবদ্ধতা থেকে বিরত রাখবে।" তার কথাগুলো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ভাসাভাসা ভাব হচ্ছে দ্বন্দ্বের সামগ্রিকতা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার না করা, কোনো বস্তুর গভীরে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূর থেকে দেখা এবং স্থূলভাবে দ্বন্দ্বের পরিলেখটি দেখার পর তখনই দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করা (প্রশ্নের জবাব, ঝগড়ার মীমাংসা, কার্য চালনা অথবা যুদ্ধ পরিচালনা) এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য।... একতরফা ও ভাসাভাসা ভাব হচ্ছে আত্মমুখীতাও, কারণ সমস্ত বাস্তবমুখী বস্তু হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ম-বিধিসম্পন্ন, কিন্তু এই অবস্থাগুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করার বদলে কিছু লোক সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক সংযুক্তি জানেন না, সেগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়মবিধি বুঝেন না, তাই এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** একতরফার অর্থ হচ্ছে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমী, অর্থাৎ সমস্যার প্রতি একটা আধিবিদ্যক মনোভাব। আমাদের কাজের বিচার করার সময়ে,

হয় সমস্তই ইতিবাচক, আর না হয় সমস্তই নেতিবাচক মনে করাটাই হচ্ছে একতরফা।... সবকিছুই ইতিবাচক হিসেবে মনে করার অর্থ হচ্ছে শুধু ভালটাই দেখা, আর খারাপটা না দেখা এবং শুধু প্রশংসাকেই সহ্য করা, সমালোচনাকে নয়। আমাদের কাজে, যেন সবকিছুই ভাল— এমন বলাটা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সবকিছুই ভাল তা নয়, ভুল-ত্রুটিও রয়েছে। কিন্তু আবার এও সত্য নয় যে, সবকিছুই খারাপ, এটাও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে না। এখানে প্রয়োজন বিশ্লেষণের। সবকিছুকে অস্বীকার করা হচ্ছে কোনো রকম বিশ্লেষণ না করেই ভাবা যে, কিছুই ভাল করা হয়নি এবং ভাবা যে, সমাজতান্ত্রিক গঠন এমন একটা মহান কার্য, মহান সংগ্রাম যার মধ্যে কয়েক শ' মিলিয়ন মানুষ যোগদান করছেন, তার মধ্যে যেন ভাল বলার মতো কিছুই নাই— যেন সবকিছুই জগাখিচুড়ি। বহু লোক এই ধরনের অভিমত পোষণ করেন, যদিও তাদের ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু তাঁদের এই ধরনের অভিমত খুবই ভুল ও ক্ষতিকর এবং এটা শুধু মানুষকে মনমরাই করতে পারে। সবকিছুই ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করাটা ভুল। "প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** কোনো সমস্যার বিচার করতে গেলে, মার্কসবাদীদের শুধু যে তার অংশবিশেষকে দেখতে হবে তা নয়, বরং তার সামগ্রিকতাকেও দেখতে হবে। একটা ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে বসে বলছে, "আকাশটা কুয়োর মুখের মতো বড়"। এটা ভুল, কারণ আকাশ যে শুধু কুয়োর মুখের মতো বড়, তা নয়। যদি সে বলে, 'আকাশের একাংশ কুয়োর মুখের মতো বড়, তাহলে এটা ঠিক, কারণ এটা বাস্তবের সঙ্গে মিলে। "জাপান-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি সম্পর্কে" (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

*** আমাদের অবশ্যই সমস্যাগুলোকে সবদিক থেকে দেখতে শিখতে হবে, শুধু যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারের সামনেটা দেখতে হবে তা-ই নয়, তার পিছনটাও দেখতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থায়, খারাপ জিনিস ভাল ফল দিতে পারে, আবার ভাল জিনিসও খারাপ ফল দিতে পারে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** আমরা স্বীকার করি যে, সাধারণ ঐতিহাসিক বিকাশে বস্তুগত জিনিস মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক অস্তিত্ব সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে; কিন্তু একই সময়ে আমরা স্বীকার করি এবং আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মানসিকতার প্রতিক্রিয়াকে, সামাজিক

অস্তিত্বের উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়াকে এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর উপরিকাঠামোর প্রতিক্রিয়াকে। এটা বস্তুবাদকে লঙঘন করে না, অপরপক্ষে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে এড়িয়ে যায় এবং দ্বন্দ্ববাদী বস্তুবাদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখে। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁরা বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমা লঙঘন করে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতে পারেন না, কিন্তু বাস্তব অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে উদ্যোগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং তা অবশ্যই করতে হবে। যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়ামঞ্চকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার উপরে গড়ে উঠতে হবে, কিন্তু তারা এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক নাট্যানুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

*** মানুষের চিন্তাধারাকে অবশ্যই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই কোনো লোকই মনে মনে ভিত্তিহীন 'আকাশ কুসুম' ভাবতে পারবেন না, বাস্তব অবস্থার দ্বারা অনুমোদিত সীমাকে অতিক্রম করে নিজেদের কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে পারবেন না এবং প্রকৃতই যা করা অসম্ভব, তা জোর করে করতে পারবেন না। কিন্তু আজকের সমস্যা হচ্ছে যে, দক্ষিণঝোঁকী রক্ষণশীল চিন্তাধারা বহু ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই কাজকেই বাস্তব অবস্থার বিকাশের সঙ্গে তাল রাখতে দিচ্ছে না। বর্তমান সমস্যা হচ্ছে যে, যা প্রয়াসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব, অনেকেই তা সম্পন্ন করাটা অসম্ভব বলে মনে করেন। "চীনের পল্লী অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক উত্তাল জোয়ার"-এর ভূমিকা (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৫)

*** সবকিছুকেই মাথা খাটিয়ে ভালভাবে ভাবতে হবে। একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, 'ভ্রূ কুচকালেই বুদ্ধি জন্মে'। অন্য কথায়, বেশি ভাবলেই প্রজ্ঞার উদয় হয়। আমাদের পার্টির ভেতরকার ঘোর অন্ধতা দূর করার জন্য ভাবতে, বস্তুর বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে শিখে নিতে এবং বিশ্লেষণের অভ্যাস লালন করতে আমাদের কমরেডদেরকে অবশ্যই প্রেরণা দিতে হবে। "অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি" (১২ এপ্রিল, ১৯৪৪)

*** কোনো প্রক্রিয়ায় যদি অনেকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি প্রধান দ্বন্দ্ব থাকবে, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে, অন্যগুলো গৌণ ও অধীনস্থ স্থান নেবে। তাই, দুই বা দুয়ের বেশি দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোনো জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই তার প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে পাবার জন্য সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা

চালাতে হবে। এই প্রধান দ্বন্দ্বকে আঁকড়ে ধরলে সব সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করা যায়। "দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** দ্বন্দ্বের দুটি দিকের মধ্যে একটা দিক অবশ্যই প্রধান, অপরটা গৌণ। যেটা প্রধান দিক, সেটাই দ্বন্দ্বের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্রকৃতি প্রধানত নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা যা কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয় নয়, দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো পরস্পরে রূপান্তর লাভ করে এবং তদানুসারে বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। ঐ

*** আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে তাই নয়, বরং কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যার সমাধানও করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নদী পার হওয়া, কিন্তু সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা পার হওয়া যায় না। সেতু বা নৌকা সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথাও বাজে কথামাত্র। "জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন" (২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪)

*** সাধারণ ও সর্বব্যাপী আহ্বান না জানালে কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে সমাবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কেবলমাত্র সাধারণ আহ্বানে সীমাবদ্ধ থাকেন, যে কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে যদি তারা বাস্তবভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংখ্যক সংগঠনে তা গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকরী না করেন, একটা নির্দিষ্ট বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ না করেন, অভিজ্ঞতা অর্জন না করেন এবং সে ধরনের অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য ইউনিটগুলোকে পরিচালনা করতে প্রয়োগ না করেন, তাহলে নিজের ডাকা সাধারণ আহ্বান নির্ভুল কি না তা পরীক্ষা করার উপায় থাকে না এবং সাধারণ আহ্বানের বিষয়বস্তুকেও পরিপূর্ণ করার উপায় থাকে না, এর ফলে এই সাধারণ আহ্বানের শূন্যে হারিয়ে যাবার বিপদ রয়েছে। "নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১ জুন, ১৯৪৩)

*** যে কোনো নেতৃস্থানীয় কর্মী যদি তাঁর অধীনস্থ পৃথক পৃথক ইউনিটগুলোর পৃথক পৃথক ব্যক্তি ও ঘটনা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন না করেন, তাহলে তিনি সমস্ত ইউনিটকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না। এই পদ্ধতির প্রসারের জন্য অবশ্যই ব্যাপকভাবে উৎসাহ

দেওয়া উচিত, যাতে করে সমস্ত স্তরের নেতৃস্থানীয় কেডারগণ তা প্রয়োগ করতে শিখে নেন। ঐ

*** যে কোনো অঞ্চলে একই সময়ে অনেকগুলো কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে না, একটা নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একটা কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কাজ পরিপূরক হিসেবে থাকতে পারে। তাই, একটা অঞ্চলের মুখ্য পরিচালককে অবশ্যই সেখানকার সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন কাজকে উপযুক্ত স্থানে সাজিয়ে রাখতে হবে; নিজে কোনো পরিকল্পনা তৈরি না করে শুধু উচ্চস্তরের নির্দেশানুসারে এক একটা কাজ করা উচিত নয়, এমনটা করলে অসংখ্য, 'কেন্দ্রীয় কাজ' এবং এলোমেলো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। উচ্চস্তরের সংস্থার পক্ষেও কাজের হাল্কা ও গুরু এবং মন্থর ও জরুরী প্রকৃতি নির্বিশেষে কোনটা কেন্দ্রীয় কাজ তার উল্লেখ না করে নিম্নস্তরের সংস্থাকে একই সময়ে অনেক কাজ করতে নির্দেশ দান করা উচিত নয়, এমন করলে নিম্নস্তরের কাজের বিন্যাস এলোমেলো হবে এবং নির্ধারিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রতিটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে সমগ্র পরিস্থিতি সমাগ্রিকভাবে বিবেচনা করে প্রতিটি বিশেষ সময়ের জন্য কাজের ভরকেন্দ্র ও কাজের ক্রম সঠিকভাবে স্থির করা এবং তা অবিচলিতভাবে পালন করা যাতে করে নির্দিষ্ট ফলার্জন সুনিশ্চিত হয়— এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের অন্যতম কৌশল। ঐ

*** প্রতিক্ষণেই কাজের অগ্রগতিকে আয়ত্ত করতে হবে, অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হবে, ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে হবে; সাধারণ হিসেব নিকেশের এবং ভুলের সামগ্রিক সংশোধনের জন্য সারসংকলন সভা ডাকার ব্যাপারে কয়েক মাস, আধা বছর বা পুরো এক বছর অপেক্ষা করা উচিত নয়। এমন করলে ক্ষতি বেশি হয়, কিন্তু যথাসময়ে ভুলগুলো সংশোধন করলে ক্ষতি কম হয়। "শিল্প বাণিজ্যের নীতি সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)

*** সমস্যাগুলো স্তুপাকারে জমিয়ে অনেক ঝামেলার সৃষ্টির প্রতীক্ষায় না থেকে, তার পূর্বেই তা সমাধান করা উচিত। পরিচালকদের অবশ্যই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে যেতে হবে পিছনে পড়ে থাকা উচিত নয়। "ঋতুভিত্তিক কাজের চুক্তি"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** আমাদের প্রয়োজন হলো, উৎসাহী কিন্তু স্থিরচিত্ত মনোবৃত্তির, উত্তেজনাময় কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ কাজের। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

*** যারা বাস্তব কাজে নিযুক্ত তাঁদের প্রত্যেককে অবশ্যই নিম্নস্তরের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে। যারা শুধু তত্ত্ব জানেন কিন্তু বাস্তব অবস্থা জানেন না, তাঁদের জন্যই এ ধরনের তদন্ত কাজ বিশেষ করে দরকার। অন্যথায় তাঁরা তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন না। তদন্ত না করলে কথা বলার অধিকার নেই, আমার এই কথাটাকে যদিও 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ' বলে বিদ্রুপ করা হয়েছে, তবুও একথা বলার জন্য আজও আমি অনুশোচনা করি না; এর জন্য অনুশোচনা করা তো দূরের কথা, এ মতে আমি এখনও দৃঢ় আছি, তদন্ত না করলে কথা বলার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। এমন অনেক লোক আছেন, যারা 'সরকারি গাড়ি থেকে নামামাত্রই' হৈ চৈ করে মতামত ঘোষণা করতে থাকেন, এটার সমালোচনা করেন, ওটার নিন্দে করেন, কিন্তু আসলে তাঁদের দশজনের মধ্যে দশজনই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ এমন অভিমত বা সমালোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এগুলো নিছক অজ্ঞ গালগল্প ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের পার্টিকে অসংখ্য বার এই সমস্ত তথাকথিত 'রাজদূতদের' হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। আর এই ধরনের 'রাজদূত' আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করছে। স্ট্যালিন ঠিকই বলেন "বিপ্লবী অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলে তত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।" নিশ্চয়ই, তার কথা আবার ঠিক, 'অনুশীলন যদি বৈপ্লবিক তত্ত্বকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ না করে, তাহলে তা হয়ে পড়বে অন্ধ অনুশীলন।' অন্ধ, ভবিষ্যতহীন ও অদূরদর্শী 'বাস্তব ব্যক্তি' ছাড়া আর কারো উপর 'সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী'— এ লেবেল এঁটে দেওয়া চলে না। "পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি" (মার্চ, এপ্রিল, ১৯৪১)

*** এই ধরনের মনোভাবই হচ্ছে তথ্য থেকে সত্য সন্ধানের মনোভাব। বাস্তবে যা আছে সেসবই হচ্ছে 'তথ্য', সত্যের অর্থ হচ্ছে তাদের অভ্যন্তরীণ সংযোগ, অর্থাৎ নিয়ম-বিধি, 'সন্ধানের' অর্থ হচ্ছে পর্যালোচনা করা। দেশ, প্রদেশ, জেলা অথবা মহকুমার ভেতরের ও বাইরের বাস্তব অবস্থা থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে এবং তার থেকেই আমরা আহরণ করবো সহজাত কিন্তু কাল্পনিক নয় এমন নিয়ম-বিধি, অর্থাৎ আমাদের কার্যকলাপের দিশারী হিসেবে পারিপার্শ্বিক ঘটনার অভ্যন্তরীণ সংযোগ। এটা করতে হলে অবশ্যই আত্মমুখী কল্পনা, ক্ষণিকের উৎসাহে মেতে উঠা এবং প্রাণহীন পুস্তকের উপরে নির্ভর করা চলবে না, বরং নির্ভর করতে

হবে তথ্যের উপর যা বাস্তবে বিদ্যমান, উপকরণগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এগুলো থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। "আমাদের শিক্ষা সংস্কার করুন" (মে, ১৯৪১)

*** 'চোখ বুজে চড়ুই ধরা', 'কানা লোকের মাছ ধরার মতো আচরণ করা, স্থূল ও বেখেয়াল হওয়া, আপন কথায় পাঁচ কাহন করা, ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা—এইরূপ জঘন্য খারাপ রীতি এখনও আমাদের পার্টির অনেক কমরেডদের মধ্যে রয়েছে। এ রীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, আমাদের শিখিয়েছেন যে, মনোযোগের সঙ্গে অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার এবং আত্মমুখী আকাঙ্ক্ষা থেকে নয় বরং বাস্তবমুখী আসল অবস্থা থেকে শুরু করা উচিত; কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড সরাসরি এ সত্যের পরিপন্থী। ঐ

*** আপনি কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন না? তাহলে, আপনি এই সমস্যার বর্তমান অবস্থান ও তার ইতিহাস অনুসন্ধান করুন! সমস্যাটাকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে অনুসন্ধান করলে তার সমাধান করার উপায় আপনি পাবেন। সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অনুসন্ধানের পরে, আগে নয়। শুধু নির্বোধ ব্যক্তি একা অথবা একদল লোক সংগ্রহ করে অনুসন্ধান না করেই মূর্খের মতো মাথা ঘামিয়ে 'উপায় ভাবতে থাকেন', 'ধারণা গড়তে থাকেন'। এ কথা বুঝা দরকার যে, এইভাবে কোনো ভাল উপায় ভেবে বের করা যায় না এবং কোনো ভাল ধারণা গড়ে তোলা যায় না। "পুস্তক পূজার বিরোধিতা করুন" (মে, ১৯৩০)

*** অনুসন্ধান হচ্ছে 'সুদীর্ঘ দশমাসব্যাপী গর্ভধারণের' মতোই। সমস্যার সমাধান 'কোনো সুন্দর প্রভাতে শিশুর জন্মলাভের' মতোই। অনুসন্ধানই হচ্ছে সমস্যার সমাধান। ঐ

*** মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতি দিয়ে চারদিকের পরিবেশকে সুব্যবস্থিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা উচিত। কেবলমাত্র উৎসাহের উপর নির্ভর করেই কাজ করা চলবে না বরং স্ট্যালিন যেমন বলেন, বিপ্লবী মনোবলকে বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। "আমাদের শিক্ষা সংস্কার করুন" (মে, ১৯৪১)

*** অবস্থাকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামাজিক অনুসন্ধান চালানো, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো। যারা কাজ পরিচালনার ভার নিয়েছেন, তাদের পক্ষে অবস্থাকে জানার সবচেয়ে মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি শহর ও গ্রাম আঁকড়ে ধরে মার্কসবাদের মৌলিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে, অর্থাৎ শ্রেণী বিশ্লেষণের পদ্ধতি দিয়ে কয়েকবার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো। "পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি" (মার্চ, এপ্রিল, ১৯৪১)

*** অনুসন্ধান সভায় প্রত্যেকবারই বেশি লোকের উপস্থিত থাকার দরকার নেই, তিন থেকে পাঁচ কিংবা সাত থেকে আটজন হলেই যথেষ্ট। এর জন্য অবশ্যই সময় নিতে হবে, অনুসন্ধানসূচী অবশ্যই থাকতে হবে, আর অবশ্যই নিজের মুখে জিজ্ঞাসা করতে হবে ও নিজের হাতে লিখতে হবে এবং সভায় উপস্থিত লোকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তাই বুকভরা উৎসাহ ছাড়া, নীচের দিকে তাকানোর দৃঢ় সংকল্প ছাড়া, জ্ঞান লাভের পিপাসা ছাড়া এবং বিশ্রী অতিদাম্ভিকতার আচরণ ত্যাগ করা ছাড়া ও আগ্রহশীল ছাত্র হবার মনোভাব ছাড়া নিশ্চয়ই এই কাজ করা অসম্ভব, তা ভালভাবে সম্পন্ন করাও অসম্ভব। ঐ

*** কমান্ডারের নির্ভুল বিন্যাস আসে তার নির্ভুল সংকল্প থেকে, তার নির্ভুল সংকল্প আসে তাঁর নির্ভুল বিচার থেকে, তাঁর নির্ভুল বিচার আসে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে এক সূত্রে গেঁথে চিন্তা করা থেকে। কমান্ডার সমস্ত সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পর্যবেক্ষণে অর্জিত শত্রুর অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করেন—গাদ ছেড়ে সার বেছে, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্য রেখে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে, বাইর থেকে ভেতরে গিয়ে; তারপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয় পক্ষের তুলনা ও পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন, এমনি করেই তিনি বিচার বিবেচনা গড়ে তোলেন, নিজের মন স্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। এই হচ্ছে রণনীতিগত পরিকল্পনা, খণ্ডযুদ্ধের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনা করার পূর্বে সামরিক বিশেষজ্ঞের পক্ষে অবস্থাকে জানার সামগ্রিক প্রক্রিয়া। "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

ভুল চিন্তাধারা সংশোধন

*** আমরা নিজদের কাজে খুব বিরাট সাফল্য অর্জন করলেও তা নিয়ে আমাদের অহংকার বা আত্মাভিমান করার কোনো যুক্তিই নেই। বিনয় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অহংকার পিছিয়ে দেয়, এই সত্যকে আমাদের অবশ্যই সর্বদা মনে রাখতে হবে। “চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ” (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

*** বিজয়লাভের কারণে পার্টির ভেতরে অহঙ্কারের মনোভাব, নিজেকে কৃতবীর বলে জাহির করার মনোভাব, প্রগতিতে অনিচ্ছুক, নিশ্চল থাকার মনোভাব, ভোগবিলাসের অনুরাগ এবং অনবরত কঠোর জীবনযাপনে অনিচ্ছার মনোভাব জন্মতে পারে। বিজয়লাভের কারণে, জনগণ আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন, বুর্জোয়া শ্রেণিও আমাদের তোষামোদ করতে এগিয়ে আসবে। শত্রুরা অস্ত্রশক্তির দ্বারা আমাদের বশে আনতে পারে না, এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে, আমাদের বাহিনীতে যাদের মনোবল দুর্বল তাঁদেরকে বুর্জোয়া শ্রেণি তোষামোদ করে বশে আনতে পারে। সম্ভবত কিছু কিছু এমন কমিউনিস্টও থাকতে পারেন, যাঁরা বন্দুকধারী শত্রুর দ্বারা বশিভূত হননি, তাঁরা এই শত্রুদের মোকাবিলার বীর উপাধি পাবার যোগ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁরা চিনির প্রলেপে আচ্ছাদিত গোলার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন না এবং এই চিনির গোলার দ্বারা পরাজিত হন। আমাদের অবশ্যই এই ধরনের অবস্থার প্রতিকার করতে হবে। “চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট” (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** এমন বহু জিনিস আছে যার মধ্যে অন্ধভাবে ও আত্মচেতনাহীনভাবে জড়িয়ে পড়লে সেসব কিছু আমাদের বোঝা ও ভার হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভুল করে কেউ এমন মনে করতে পারে— ‘যাই হোক না কেন, আমি ভুল করেছি’— অতএব, নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, যে লোক ভুল করেননি, তিনিও মনে করতে পারেন যে— ‘আমি তো কোনো ভুল করিনি’— অতএব, তিনি গর্বে ফুলে উঠেন। কাজের অসফলতা লোককে নিরাশ ও ম্লান করতে পারে, আবার সফলতা তাকে অহঙ্কারে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারে। সংগ্রামের ইতহাস ছোট বলে কেউ কেউ নিজের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে থাকেন; আবার কেউ কেউ সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ বলে সব সময়ে নিজেকে নির্ভুল বলে মনে করেন। শ্রমিক ও কৃষক

নিজেদের শ্রেণিভিত্তিক গৌরবের জন্য বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কারের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন; আবার বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের কোনো না কোনো জ্ঞান আছে বলে শ্রমিককৃষকদের অহঙ্কারের দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। যে কোনো বিশেষ জ্ঞান আত্মঅহঙ্কারের এবং অন্যের প্রতি অবজ্ঞার পুঁজিতে পরিণত হতে পারে। এমনকি বয়সও অহঙ্কারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে; যুবকরা নিজেরা বুদ্ধিমান ও কর্মঠ বলে বৃদ্ধদের অবহেলা করতে পারেন, আবার বৃদ্ধরাও নিজেরা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বলে যুবকদের অবজ্ঞা করতে পারেন। এই ধরনের সমস্ত জিনিসের প্রতি আমরা যদি আত্মসচেতন না থাকি, তাহলে এগুলো আমাদের ভার অথবা বোঝা হয়ে উঠতে পারে। "অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি" (১২ এপ্রিল, ১৯৪৪)

*** সৈন্যবাহিনীতে কার্যরত কিছুসংখ্যক কমরেড অহঙ্কারী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা সৈনিক, জনগণ, সরকার ও পার্টির প্রতি অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করেন, তাঁরা শুধুমাত্র স্থানীয় কার্যে নিয়োজিত কমরেডদেরই নিন্দা করেন, কখনও নিজেদের নিন্দা করেন না, কেবল নিজেদের সাফল্যকে দেখেন, ত্রুটি দেখেন না এবং তোষামোদের কথাই শুনতে পছন্দ করেন, সমালোচনা নয়।... এই ধরনের ব্যাধি দূর করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। "সংগঠিত হোন" (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** কঠিন কাজ যেন আমাদের সামনে রাখা ভারের মতো, দেখি, তাকে কাঁধে তুলে নেবার সাহস আমাদের আছে কি না। কোনো কোনো ভার ভারী এবং কোনো কোনোটা বা হাল্কা হয়ে থাকে। কেউ কেউ ভারীটা ভয় করেন, হাল্কাটা গ্রহণ করেন, ভারীগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেন, হাল্কাগুলো নিজেরা তুলে নেন। এই মনোভাব ভাল নয়। কোনো কোনো কমরেড এ ধরনের নন, তাঁরা সুখ সুবিধা অপরের জন্য ছেড়ে দেন এবং ভারী ভার তুলে নেন; তাঁরা দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে সবার আগে আসেন আর সুখ সুবিধা ভোগ করতে সবার পিছনে পড়েন। এই ধরনের কমরেডই হচ্ছেন ভাল কমরেড। এই ধরনের কমিউনিস্ট ভাবমানস আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। "ছুংছিং আলাপ আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তাঁরা ভারীটা ভয় করেন, হাল্কাটা গ্রহণ করেন, ভারী ভারগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেন, নিজেরা হাল্কাটা বহন করেন। যদি তাঁদের সামনে কোনো কাজ পড়ে, তাহলে প্রথমে তারা নিজেদের কথা ভাবেন, তারপর অন্যদের। সামান্য একটা কাজ করলেই তারা আত্মঅহমিকায় মেতে উঠেন,

নিজেদের বড়াই করতে তারা ভালবাসেন, তাঁরা এই ভয় করেন যে, তাদের কাজ সম্পর্কে হয়তো অপরে জানতে পারবে না। তারা কমরেড ও জনগণের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না, বরং নিরুত্তাপ, যত্নহীন ও নির্দয় ব্যবহার করেন। আসলে এই ধরনের লোক কমিউনিস্ট নন, অন্ততপক্ষে তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না। "নর্ম্যান বেথুন স্মরণে" (২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

*** এই ধরনের 'স্বতন্ত্রতার' ধান্দায় ঘুরছেন এমন লোক সর্বদাই 'আমি প্রথম' নীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং তারা ব্যক্তিবিশেষ ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে প্রায়ই ভুল করে থাকেন। তারা যদিও বুলিতে পার্টির সম্মান করেন, কিন্তু কার্যত নিজেদেরকেই প্রথম স্থান দেন এবং পার্টিকে দেন দ্বিতীয় স্থান। এই ধরনের লোক কিসের ধান্দায় ঘুরছেন? তারা খ্যাতি, পদ ও আত্মপ্রচারের জন্য ঘুরছেন। কাজের কোনো এক অংশের দায়িত্ব তাদের দিলে তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতার ধান্দায় থাকেন। এর উদ্দেশ্য, তারা কিছু লোককে পক্ষে টেনে আনেন আর কিছু লোককে ঠেলে সরিয়ে রাখেন এবং কমরেডদের মধ্যে পরস্পরকে তোষামোদ ও টানাটানি করেন, তাঁরা বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টির ইতর রীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসেন। তাঁদের অসততাই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমি মনে করি, আমাদের সৎভাবে কাজ করা উচিত, কারণ পৃথিবীতে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে সৎ মনোভাব ছাড়া তা করা একেবারেই অসম্ভব। "পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ" (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২)

*** আংশিক প্রয়োজনকে সামগ্রিক প্রয়োজনের বশে আনার সত্যকে কমিউনিস্টদের অবশ্যই বুঝতে হবে। যদি কোনো মতামত আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কার্যকর বলে মনে হয়, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে তা অকার্যকর বলে মনে হয়, তাহলে অংশকে সমগ্রের বশ মানতে হবে। এর বিপরীত অবস্থায় যদি কোনো মতামত আংশিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে অকার্যকর বলে মনে হয়, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির দৃষ্টিতে কার্যকর বলে মনে হয়, তাহলেও অংশকে সমগ্রের বশ মানতে হবে। এটাই হচ্ছে সমগ্রকে বিবেচনা করার দৃষ্টিকোণ। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** ভোগবাদ। লাল ফৌজের বেশ কিছু লোক আছেন যাদের ব্যক্তিতাবাদ ভোগবিলাসের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। তারা সব সময়েই আশা করেন যে, তাদের বাহিনী বড় বড় শহরে যাবেন। তারা যে শহরে কাজ করার জন্য যেতে চান তা নয়, বরং ভোগবিলাসের জন্যই যেতে চান। লাল এলাকায়

যেখানে জীবনযাত্রা কঠোর, সেখানে কাজ করতে তারা সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** আমাদের অবশ্যই স্ববিভাগীয়বাদী ঝোঁকের বিরোধিতা করতে হবে; এই ঝোঁকের দ্বারা শুধু নিজের স্বার্থেরই যত্ন নেওয়া হয়, অপরের কথা চিন্তা করা হয় না। যারা অন্যের কষ্টে উদাসীন থাকেন, অন্য লোকের অনুরোধে অধীনস্থ কেডারদের সেখানে যেতে দিতে অস্বীকার করেন অথবা খারাপ কেডারদের অন্যদেরকে দেন, 'প্রতিবেশীর জমিকে তার বাড়তি জল নিষ্কাশনের নালী হিসেবে ব্যবহার করেন' এবং অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল বা মানুষের জন্য মোটেও ভাবেন না—এই ধরনের লোকই হচ্ছেন স্ববিভাগীয়বাদী, যিনি কমিউনিজমের ভাবমানস পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। সমগ্রের প্রতি অমনোযোগী থাকা, অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল ও লোকের প্রতি যত্নহীন থাকাই হচ্ছে স্ববিভাগীয়বাদীর বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের লোকদের শিক্ষাদানের কাজ আমাদেরকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে, যাতে করে তারা বুঝতে পারেন যে, এটা হচ্ছে একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক এবং যদি একে প্রসারিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠবে। "পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ" (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** উদারতাবাদ বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। যখন সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, কোনো লোক ভুল পথে যাচ্ছেন, অথচ সে লোক একজন পুরনো পরিচিত লোক, একই জায়গার অধিবাসী সহপাঠী, ঘনিষ্ঠবন্ধু, প্রিয়জন, পুরনো সহকর্মী বা পুরনো অধীনস্থ লোক বলে তার সঙ্গে নীতিগতভাবে যুক্তিতর্ক না করা, শান্তি ও সখ্যতা বজায় রাখার জন্য তাকে অবাধে চলতে দেওয়া, অথবা তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য হাল্কাভাবে কিছু বলা, কিন্তু চূড়ান্তভাবে মীমাংসার চেষ্টা না করা। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে প্রথম প্রকারের।

নিজের প্রস্তাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়ভাবে উত্থাপন না করে আড়ালে দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা করা। সামনাসামনি কিছু না বলে পেছনে বাজে গুজব রটনা করা; সভায় কিছু না বলা, কিন্তু পরে আজে বাজে কথা বলা। যৌথ জীবনযাত্রার নীতির প্রতি আদৌ কোনো প্রকার শ্রদ্ধা না জানিয়ে নিজের ঝোঁকে চলা। এটা দ্বিতীয় প্রকারের। যদি কোনো ব্যাপার নিজেকে স্পর্শ না করে, তাহলে তাকে শিকায় তুলে রাখা; কোনো বিষয়কে স্পষ্টতই ভুল জেনেও সে বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব কম বলা; গা বাঁচানোর

জন্য দোষ এড়িয়ে নির্বিবাদে ভাল মানুষ সেজে থাকা। এটা তৃতীয় প্রকারের।

আদেশ অমান্য করা এবং ব্যক্তিগত মতামতকে প্রথমে স্থান দেওয়া। সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ সুবিধা দাবি করা, কিন্তু সংগঠনের শৃঙ্খলা অস্বীকার করা। এটা চতুর্থ প্রকারের।

ঐক্য, অগ্রগতি বা সুষ্‌ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক না করা, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থের চেষ্টা করা। এটা পঞ্চম প্রকারের।

ভুল মতামত শুনেও যুক্তিতর্ক না করা, এমনকি প্রতিবিপ্লবীর কথা শুনেও সে সম্বন্ধে কোনো রিপোর্ট না করা, বরং সেগুলো নির্বিকারভাবে দেখা যেন কিছুই ঘটেনি। এটা ষষ্ঠ প্রকারের।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচার না করা, তাদেরকে উৎসাহিত না করা, বক্‌তৃতা না দেওয়া, তদন্ত ও অনুসন্ধান না করা, তাঁদের সুখদুঃখে মনোযোগ না দেওয়া, তাঁদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সে কথা ভুলে নিজেকে হেয় করে একজন সাধারণ লোকের মতো আচরণ করা। এটা সপ্তম প্রকারের।

জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতিকর আচরণ দেখেও মনে কোনো ক্ষোভ না জাগা, তাকে উপদেশ দিয়ে বিরত না করা, না থামানো, যুক্তি দিয়ে তাকে না বুঝানো, বরং জেনে শুনেও তাকে সে কাজ করে যেতে দেওয়া। এটা অষ্টম প্রকারের।

কাজকর্মে মনোযোগ না দেওয়া, কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছাড়াই কাজ করা, তাচ্ছিল্যভরে কাজ করা এবং কোনো মতে চলনসই হওয়া—'যতদিন মঠের সন্ন্যাসী থাকবো ততদিন ঘণ্টা বাজিয়েই যাবো। এটা নবম প্রকারের।

বিপ্লবের জন্য নিজে বিরাট অবদান রেখেছেন বলে মনে করা, প্রবীণ অভিজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করা, বড় কাজে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোট কাজ করতে না চাওয়া, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং পড়াশুনায় ঢিলে

দেওয়া। এটা দশম প্রকারের। নিজের ভুল জেনেও তা সংশোধনের চেষ্টা না করা, নিজের প্রতি উদারতাবাদ অবলম্বন করা। এটা একাদশ প্রকারের। “উদারতাবাদের বিরোধিতা করুন” (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

*** বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের ভেতরে উদারতাবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক বস্তু, যা ঐক্য ছিন্ন করে, সম্পর্ক শিথিল করে, কাজে নিষ্ক্রিয়তা আনে এবং মতভেদ সৃষ্টি করে। এটা বিপ্লবী বাহিনীকে দৃঢ় সংগঠন ও শৃঙ্খলা থেকে বঞ্চিত করে, নীতিগুলোকে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা অসম্ভব করে তুলে এবং পার্টি যাদের পরিচালিত করে সেই জনসাধারণ থেকে পার্টি সংগঠনকে পৃথক করে দেয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য ঝোঁক। ঐ

*** উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমূর্ত বেদবাক্য হিসেবে দেখেন। মার্কসবাদকে তারা অনুমোদন করেন, কিন্তু তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন, নিজেদের উদারতাবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতেও তৈরি নন। এইসব লোকের মার্কসবাদ আছে, আবার তাদের উদারতাবাদও আছে, মুখে তারা মাকর্সবাদের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ; অন্যদের প্রতি তারা প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, কিন্তু নিজেদের প্রতি তারা প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ। দুই ধরনের জিনিসই মজুদ আছে, প্রত্যেকটির ব্যবস্থা পৃথক। এই হচ্ছে কিছু লোকের চিন্তাধারার পদ্ধতি। ঐ

*** জনগণের রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করে। শুধু জনগণের রাষ্ট্র থাকলেই জনগণ সারা দেশব্যাপী ও সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা নিজেদের শিক্ষিত ও পুনর্গঠিত করতে পারবেন, স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব (যা এখনও খুবই জোরদার, যা দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে এবং যাকে দ্রুত বিনাশ করা যায় না) থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবেন, পুরনো সমাজ থেকে অর্জিত বদভ্যাস ও খারাপ মতাদর্শ দূর করে দিতে পারবেন, নিজেদেরকে প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্দেশিত বিপথে যেতে দেবেন না এবং অনবরত অগ্রসর হতে থাকবেন—অগ্রসর হতে থাকবেন সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের দিকে। “জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে” (৩০ জুন, ১৯৪৯)

*** একটা ভাল কাজ করা কারো পক্ষেই কঠিন নয়, কঠিন হচ্ছে সারা জীবন ধরে ভাল কাজ করা, কখনও কোনো খারাপ কাজ না করা, সর্বদা ব্যাপক জনসাধারণ, যুবক ও বিপ্লবের জন্য হিতকর হওয়া, কয়েক দশক ধরে একটানা কঠোর সংগ্রাম করা—এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ!

"কমরেড উ ইউ-চাংয়ের ৬০তম জন্ম দিবসে অভিনন্দন বাণী" (১৫ জানুয়ারি, ১৯৪০)

ঐক্য

*** রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, জনগণের ঐক্য ও দেশের ভেতরকার বিভিন্ন জাতির ঐক্য – এগুলোই হচ্ছে আমাদের কার্যের অপরিহার্য বিজয়ের মৌলিক নিশ্চয়তা। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের মাধ্যমেই সমগ্র শ্রেণি ও সমগ্র জাতির ঐক্য অর্জন করা যায়, কেবলমাত্র সমগ্র শ্রেণি ও সমগ্র জাতির ঐক্যের মাধ্যমেই শত্রুকে পরাজিত করা যায় এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করা যায়। "কোটি কোটি জনসাধারণকে জাপানবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে আনার জন্য সংগ্রাম" (৭ মে, ১৯৩৭)

*** গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সংগঠন ও শৃঙ্খলার মূলনীতিতে আমাদের পার্টির সমস্ত শক্তিকে আমাদের দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যে কোনো কমরেডই হোন না কেন, শুধু তিনি যদি পার্টির কর্মসূচি, পার্টির নিয়মাবলী ও পার্টির সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলেই আমাদের তাঁর সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** ১৯৪২ সালে, আমরা জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট রূপদান করার জন্য একটি সূত্র দিয়েছিলাম, তার নাম "ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্য"। বিশদভাবে বলতে গেলে, এর অর্থ হয় যে, ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুরু করা, সমালোচনা অথবা সংগ্রামের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা, যাতে একটা নতুন ভিত্তিতে নতুন ঐক্যে উপনীত হওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে এটাই জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার সঠিক পদ্ধতি। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

*** এই সৈন্যবাহিনীর ভেতরে ও বাইরে একটা চমৎকার ঐক্য রয়েছে। এর ভেতরের ঐক্য রয়েছে – অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে, উপরিস্থ ও অধীনস্থদের মধ্যে এবং সামরিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ ও পশ্চাৎবর্তী পরিচর্যা কাজের মধ্যে; আর বাইরের ঐক্য রয়েছে-সৈন্যবাহিনী ও মিত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। যা কিছু ঐক্যের ক্ষতি করে, সে সবকিছুকে অবশ্যই দূর করতে হবে। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

শৃংখলা

*** জনগণের ভেতরে, গণতন্ত্র কেন্দ্রীকতার সংগে সম্পর্কিত এবং স্বাধীনতা শৃংখলার সংগে সম্পর্কিত। এ সবই হচ্ছে একটি একক বস্তুর দুটি বিপরীত দিক, তারা পরস্পর বিরোধী, আবার ঐক্যবদ্ধও; আমাদের একটার উপর একতরফাভাবে জোর দিয়ে অন্যটাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। জনগণের ভেতরে, স্বাধীনতা ছাড়া চলে না, শৃংখলা ছাড়াও চলে না; গণতন্ত্র ছাড়া চলে না, কেন্দ্রীকতা ছাড়াও চলে না। এই ধরনের গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীকতার একত্ব এবং স্বাধীনতা ও শৃংখলার একত্বের অর্থ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা। এই ব্যবস্থায় জনগণ ব্যাপক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করেন; একই সময়ে আবার সমাজতান্ত্রিক শৃংখলার মধ্যে অবশ্যই তাঁদের নিজদেরকে আবদ্ধ রাখতে হয়। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

*** অবশ্যই পার্টির শৃংখলাকে পুনরায় উল্লেখ করতে হবে:

১। ব্যক্তি সংগঠনের অধীন;

২। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন;

৩। নিম্নতর স্তর উচ্চতর স্তরের অধীন;

৪। সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন।

যে কেউ এ শৃংখলাকে লংঘন করে, সেই পার্টির ঐক্যকে বিনষ্ট করে। "জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর , ১৯৩৮)

*** পার্টির অন্যতম শৃংখলা হলো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন, সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল করা হয়, তাহলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, এছাড়া কার্যকলাপে কোনো রকম আপত্তিই প্রকাশ করা উচিত নয়। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** তিনটি বৃহৎ শৃংখলা নিম্নরূপ:

১। সকল কার্যক্রিয়ায় আদেশ মেনে চলুন;

২। জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সূচ কিংবা সূতোও নেবেন না;

৩। দখলকৃত সমস্ত জিনিস জমা দেবেন।

মনোযোগ দেবার আটটি ধারা নিম্নরূপ:

১। ভদ্রভাবে কথা বলুন ;

২। ন্যায্য মূল্যে কেনা-বেচা করুন;

৩। ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরৎ দিন;

৪। কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন;

৫। লোকজনকে মারবেন না, গালি দেবেন না;

৬। ফসল নষ্ট করবেন না;

৭। নারীদের সংগে অশোভন ব্যবহার করবেন না;

৮। বন্দী সৈন্যদের সংগে দুর্ব্যবহার করবেন না। "তিনটি বৃহত্ শৃংখলা ও মনোযোগ দেবার আটটি ধারা পুনর্ঘোষণা সম্পর্কে চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের সদর দপ্তরের নির্দেশ" (১০ অক্টোবর , ১৯৪৭)

*** শৃংখলাবোধকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে, দৃঢ়তার সংগে আদেশ পালন করতে হবে, নীতি পালন করতে হবে, তিনটি বৃহত্ শৃংখলা ও মনোযোগ দেবার আটটি ধারা পালন করতে হবে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের এক হতে হবে, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের এক হতে হবে, অফিসার ও সৈনিকদের এক হতে হবে এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনীর এক হতে হবে; কোনো রকমের শৃঙ্খলা লঙঘনের অনুমতি দেওয়া হবে না। "চিনা গণ-মুক্তি ফৌজের ঘোষণা" (অক্টোবর, ১৯৪৭)

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা

*** কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচনাকে ভয় করে না, কারণ আমরা মার্কসবাদী, সত্য আমাদের পক্ষে এবং বুনিয়াদি জনসাধারণ—শ্রমিক ও কৃষকেরা আমাদের পক্ষে। প্রচার কার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** পুরো বস্তুবাদীরা নির্ভীক, আমরা আশা করি যে, সমস্ত লোক যাঁরা আমাদের সংগে একত্রে সংগ্রাম করেন, তাঁরা সাহসের সংগে তাঁদের দায়িত্ব বহন করবেন, বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করবেন, অকৃতকার্যতাকে ভয় করবেন না, কেউ গুজব রটালে কিংবা বিদ্রুপ করলে তা'ও ভয় করবেন না এবং আমাদের কমিউনিস্টদের প্রতি সমালোচনা চালাতে ও প্রস্তাব পেশ করতেও ভয় করবেন না। "সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও সম্রাটকে ঘোড়া থেকে সাহসের সংগে টেনে নামিয়ে দিতে হবে"—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামে আমাদের অবশ্যই এই ধরনের নির্ভীকতার মহান মনোবল থাকতে হবে। প্রচার কার্য সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, (১২ মার্চ, ১৯৫৭)

*** সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা—এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হাতিয়ার আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা অশুভ রীতিকে ত্যাগ করতে পারি এবং শুভ রীতিকে বজায় রাখতে পারি। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট; ৫ মার্চ, ১৯৪৯

*** প্রকৃত আত্মসমালোচনা করা হয় কি না, এটাও হচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির থেকে আমাদের পার্টির পারস্পরিক পার্থক্যের অন্যতম সুস্পষ্ট নিদর্শন। যেমন আমরা বলি, ঘরে নিয়মিত ঝাড়ু দিতে হবে, ঝাড়ু না দিলে ধূলো জমবে; মুখ নিয়মিত ধুতে হবে, না ধুলে মুখও নোংরা হয়ে যাবে। আমাদের কমরেডদের চিন্তাধারায়ও আমাদের পার্টির কাজেও ধূলো জমতে পারে, তাও ঝাড়ু দেয়া ও ধোয়া প্রয়োজন। "স্রোতের জল দূষিত হয় না, কপাটের কব্জা পোকায় খায় না"— এ প্রবাদের অর্থ হচ্ছে যে, তারা অবিরাম গতির মধ্যে জীবাণু বা অন্যান্য জীবসত্তার অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করে। আমাদের পক্ষে, আমাদের কাজকে নিয়মিতভাবে যাচাই করা, যাচাইয়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতির বিস্তার করা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভয় না করা এবং "যা জানেন বলুন, যদি বলেন সবটাই বলুন," "বক্তাকে দোষ দেবেন না, তাঁর কথাকে সতর্কবাণী

হিসেবে গ্রহণ করুণ", "ভুল থাকলে তাকে শুধরে নিন, না থাকলে সতর্ক হোন" চীনা জনগণের এসব হিতকর নীতিকথা প্রয়োগ করা— এটাই হচ্ছে আমাদের কমরেডদের চিন্তাধারায় ও আমাদের পার্টির দেহে নানা রকম রাজনৈতিক ধূলো ও রাজনৈতিক জীবাণুর অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করার একমাত্র কার্যকরী উপায়। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** পার্টির ভেতরে বিভিন্ন চিন্তাধারার বিরোধ ও সংগ্রাম নিরন্তর ঘটতে থাকে। এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীর দ্বন্দ্বের এবং নূতন ও পুরাতনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। পার্টির ভেতরে যদি দ্বন্দ্ব না থাকে এবং তা সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকে, তাহলে পার্টির জীবন শেষ হয়ে যাবে। "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে" (আগস্ট, ১৯৩৭)

*** আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের পক্ষ নেই, কারণ এটা হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টির ভেতরকার ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভেতরকার ঐক্যলাভের হাতিয়ার। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীর এই হাতিয়ার গ্রহণ করা উচিত।
কিন্তু উদারতাবাদ মতাদর্শগত সংগ্রামকে বাতিল করে দেয় এবং নীতিহীন শান্তির পক্ষ নেয়, এর ফলে ক্ষয়িষ্ণু ও অশিষ্ট রীতির সৃষ্টি হয় এবং পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কোনো কোনো ইউনিট এবং কোনো কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটে। "উদারতাবাদের বিরোধিতা প্রসঙ্গে" (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

*** আত্মমুখীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও পার্টিতে একঘেয়ে ধরনের লেখার বিরোধিতা করার সময় আমাদের অবশ্যই দু'টি কথার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে: প্রথমটা হচ্ছে "অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানো", দ্বিতীয়টা হচ্ছে "রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো"। মুখ না দেখে অতীতের ভুলগুলো অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে, অতীতের খারাপ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে করে ভবিষ্যতের কাজ আরও সতর্কতার সংগে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে "অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতের ভুল এড়ানোর" অর্থ। কিন্তু ভুল উদঘাটন করার ও ত্রুটি সমালোচনা করার আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমন চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেন সম্পূর্ণভাবে রোগীকে বাঁচানোর জন্যই—তাকে মেরে ফেলার জন্য নয়। একজন এপেন্ডিসাইটিস রোগে ভুগছে, এমন ব্যক্তির উপাঙ্গটি চিকিৎসক যদি কেটে দেন তখনই সে বাঁচে। কোনও লোক ভুল করে, যদি সে চিকিৎসার ভয় না করে, রোগকে

গোপন না রাখে, ভুলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরে, চিকিৎসার সাধ্যাতীত অবস্থায় না পড়ে এবং সত্যি সত্যি আন্তরিকভাবে চিকিৎসা করতে চায় ও ভুল শোধরাতে ইচ্ছুক থাকে, তবে আমাদের উচিত তাকে স্বাগত জানানো ও তার রোগ সারানো, যাতে সে একজন ভালো কমরেড হয়ে উঠে। যদি ক্ষণিক আত্মতুষ্টির জন্য তীব্র কশাঘাত করা হয়, তাহলে একাজ কখনো সফল হবে না। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসায় কখনো রুক্ষ ও বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং "রোগ সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো"— এই মনোভাব গ্রহণ করা উচিত, শুধু এটাই নির্ভুল ও ফলপ্রদ পদ্ধতি। "পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ" (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** পার্টির ভেতরকার সমালোচনার সমস্যা সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত, সেটা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো কমরেড সমালোচনা করার সময় বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপারে, যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তির সংগে জড়িত না হয়, তাহলে ছিদ্রানুসন্ধানের কোনো দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব হয়ে পড়বেন। অধিকন্তু, এ ধরনের সমালোচনা যদি একবার বিকাশ লাভ করে, তাহলে পার্টির ভেতরের মনোযোগ শুধু ছোটখাটো ত্রুটির উপরেই কেন্দ্রীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্রলোক হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য। এটা খুবই বিপদজনক। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** পার্টির ভেতরকার সমালোচনায়, আত্মমুখীতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও সমালোচনার ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে, কথা বলার সময় তথ্যভিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনায় রাজনৈতিক দিকের উপর মনোযোগ দিতে হবে। "পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** পার্টির ভেতরকার সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লাল ফৌজের পার্টির ভেতরকার সমালোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোনো কোনো সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, শুধুমাত্র ব্যক্তি-বিশেষেরই নয়, বরং পার্টির সংগঠনেরও সর্বনাশ হয়। এটা

হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণির ব্যক্তিতাবাদের অভিব্যক্তি। শুধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টি-সদস্যদের বুঝানো যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিসংগ্রামে জয়লাভের জন্য পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো; আর সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। “পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে” (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

*** আমরা জনগণের সেবা করি, তাই আমাদের কোনো ত্রুটি থাকলে, তা দেখিয়ে কোনো লোক আমাদের সমালোচনা করলে, আমরা ভয় করি না। যিনিই হোন না কেন, সবাই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি আপনার কথা ঠিক হয়, তাহলে আমরা নিজেদের ত্রুটি শুধরে নেব। আপনি যে প্রস্তাব করবেন তাতে যদি জনগণের উপকার হয়, তবে আমরা আপনার প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করবো। “জনগণের সেবা” (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

*** আমরা চীনা কমিউনিস্টরা ব্যাপকতম চীনা জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থকে আমাদের সমস্ত কাজের যাত্রাবিন্দু বলে মনে করি; আমাদের কার্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলে আমরা বিশ্বাস করি, নিজদের সবকিছু ত্যাগ করতে মোটেই দুঃখবোধ করি না, নিজদের কার্য সাধনের জন্য আমরা সব সময়েই প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত। তাই জনগণের অনুপযোগী চিন্তাধারা, দৃষ্টিকোণ, মতামত বা পদ্ধতি ত্যাগ করতে কি অনিচ্ছুক হতে পারি? আমরা কি কোনো রাজনৈতিক ধূলো ও রাজনৈতিক জীবাণুকে আমাদের নির্মল মুখমণ্ডলকে নোংরা করতে অথবা আমাদের সুস্থ দেহে সংক্রমিত হতে স্বাগত জানাতে পারি। অসংখ্য বিপ্লবী শহীদ, জনগণের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে প্রাণ বলি দিয়েছেন, তাঁদের কথা মনে পড়লেই আমাদের প্রতিটি জীবিত লোকের হৃদয় বেদনায় ভরে ওঠে, এমন কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ কী থাকতে পারে যা আমরা বিসর্জন দিতে পারবো না? অথবা এমন কোনো ভুল কি থাকতে পারে যা আমরা ত্যাগ করতে পারবো না? “যুক্ত সরকার সম্পর্কে” (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** সাফল্য দেখলে আমাদের কখনো আত্মতুষ্ট হওয়া উচিত নয়। আত্মতুষ্টতাকে আমাদের সংযত করতে হবে এবং প্রতিক্ষণেই নিজদের ত্রুটি সমালোচনা করতে হবে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং ধূলো দূর করার জন্য আমরা রোজ মুখ ধুয়ে থাকি ও মেঝে ঝাড়ু দিয়ে থাকি। “সংগঠিত হোন” (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** সমালোচনা যথাসময়ে করা উচিত, ঘটনা ঘটে যাবার পর সমালোচনা করার শখ থাকা উচিত নয়। “কৃষি-সমবায়করণের সমস্যা সম্পর্কে” (৩১ জুলাই, ১৯৫৫)

*** ভুল-ভ্রান্তি ও অকৃতকার্যতা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, ফলে আমরা আরো বিজ্ঞ হয়েছি এবং আমাদের কাজ আরো ভালোভাবে করছি। যে কোনো রাজনৈতিক পার্টি যা যে কোনো লোকের পক্ষেই ভুল এড়িয়ে যাওয়া কঠিন, কিন্তু আমাদের যথাসম্ভব কম ভুল করা উচিত। যদি ভুল ঘটে, তাহলে আমাদের তা শুধরানো উচিত, যত দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে তা শুধরানো যায়, ততই ভাল। “জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে” (৩০ জুন, ১৯৪৯)

কমিউনিস্ট

*** একজন কমিউনিস্টের মুক্ত মন, বিশ্বস্ত ও সক্রিয় হতে হবে, বিপ্লবের স্বার্থকে নিজের প্রাণের চেয়েও ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের বশে রাখতে হবে; তাঁকে সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমস্ত ভুল চিন্তাধারা এবং আচরণের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করতে হবে, যাতে করে পার্টির যৌথ জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যকার সংযোগকে দৃঢ় করা যায়; ব্যক্তি-বিশেষের চাইতে পার্টির ও জনসাধারণের সম্বন্ধে এবং নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে তাঁকে বেশি যত্নশীল হতে হবে। শুধু এমনি হলেই তাঁকে কমিউনিস্ট বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। "উদারতাবাদের বিরোধিতা করুন" (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

*** প্রত্যেক কমরেডকে এটা অবশ্য বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, কমিউনিস্টের সমস্ত কথার ও কাজের চরম মাপকাঠি হচ্ছে সেগুলো ব্যাপকতম জনসাধারণের পরম স্বার্থের সংগে খাপ খাচ্ছে কি না এবং ব্যাপকতম জনসাধারণের সমর্থন পাচ্ছে কি না। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** যে কোনো সময়েই এবং যে কোনো স্থানেই একজন কমিউনিস্টকে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রথম স্থান দেয়া উচিত নয়, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতির ও জনসাধারণের স্বার্থের বশে রাখতে হবে। তাই, স্বার্থপরতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং কাজে ফাঁকি দেওয়া, দুর্নীতি ও আত্মপ্রচারবাদ প্রভৃতিই সবচেয়ে ঘৃণার্হ; কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা, সক্রিয় প্রচেষ্টা, জনগণের কার্যে আত্মত্যাগ স্বীকার এবং নীরব ও কঠোর কর্মের মনোবলই সম্মান লাভের যোগ্য। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে কমিউনিস্টদেরকে অবশ্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ যে কোনো সত্যই জনগণের স্বার্থের সংগে সংগতিপূর্ণ; কমিউনিস্টদেরকে অবশ্যই ভুল সংশোধন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ যে কোনো ভুল জনগণের স্বার্থের সংগে সঙ্গতিবিহীন। "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** যে কোনো ব্যাপারেই কমিউনিস্টদের অবশ্যই ‘কেন’ বলে প্রশ্ন করতে হবে, নিজের মাথা খাটিয়ে বিস্তারিতভাবে ভাবতে হবে যে, বিষয়টা বাস্তবের সংগে মিলছে কি না, তা প্রকৃতই যুক্তিসংগত কি না; অন্ধভাবে অনুসরণ করা ও দাসত্ববাদকে উৎসাহ দেয়া কোনো মতেই উচিত নয়। “পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ” (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** সমগ্রের স্বার্থকে বিবেচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রতিটি পার্টি-সদস্য, প্রতিটি আংশিক কর্ম, প্রতিটি কথা বা কাজক্রিয়াকে অবশ্যই সমগ্র পার্টির স্বার্থে আরম্ভ করতে হবে; কোনো মতেই এ নীতি লঙ্ঘন করার অনুমতি দেয়া চলবে না। ঐ

*** কমিউনিস্টদের বাস্তবনিষ্ঠ ও দূরদর্শী হবার আদর্শ হতে হবে। কারণ কেবলমাত্র বাস্তবনিষ্ঠ হলেই নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করা যায় এবং কেবলমাত্র দূরদর্শী হলেই অগ্রগতির দিশা হারায় না। “জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান” (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** কমিউনিস্টদের সবচেয়ে দূরদর্শী, সবচেয়ে আত্মত্যাগী, সবচেয়ে দৃঢ় হতে হবে এবং বিনয়ের সঙ্গে অবস্থার বিবেচনা করতে সবচেয়ে সক্ষম হতে হবে, জনসাধারণের অধিকাংশের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাদের সমর্থন পেতে হবে। “জাপানবিরোধী যুদ্ধকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য” (৩ মে, ১৯৩৭)

*** অধ্যয়নেও কমিউনিস্টদেরকে আদর্শ হতে হবে, তারা প্রতিদিনই জনসাধারণের শিক্ষক, আবার, প্রতিদিনই জনসাধারণের ছাত্র। “জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান” (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** গণআন্দোলনে প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই জনসাধারণের বন্ধু হতে হবে, তাদের উপরওয়ালা নয়; ধৈর্যশীল শিক্ষক হতে হবে, আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিজ্ঞ নয়। কমিউনিস্টকে কোনো মতেই জনসাধারণের সংখ্যাগুরু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়, অধিকাংশ লোকের অবস্থা বিবেচনা না করে অল্পসংখ্যক প্রগতিশীল বাহিনীকে পরিচালিত করে একা দুঃসাহসিকভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও প্রগতিশীল ব্যক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সংখ্যাধিক্যকে বিবেচনা করার দৃষ্টিকোণ। ঐ

*** আমরা কমিউনিস্টরা হচ্ছি বীজের মতো, জনগণ হচ্ছেন জমির মতো। আমরা যেখানেই যাই না কেন, সেখানকার জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে, জনগণের মধ্যে শিকড় গাড়তে এবং প্রস্ফুটিত হতে হবে। “ছুংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে” (১৭ অক্টোবর, ১৯৪৫)

*** আমাদের কমিউনিস্টদের, যে কোনো ব্যাপারেই, অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে একান্ত হতে সক্ষম হওয়া উচিত। যদি আমাদের পার্টি সদস্যরা সারা জীবন ঘরের ভেতরে বসে বসে কাটিয়ে দেন এবং ঝড়ঝাপটা মোকাবিলা করার ও দুনিয়ার মুখোমুখী হবার জন্য বাইরে না যান, তাহলে এই ধরনের পার্টি সদস্যরা চীনা জনগণের জন্য কোনো উপকারে আসবেন কি? কোনো উপকারেই আসবেন না, পার্টি সদস্য হিসেবে এ ধরনের লোকের আমাদের কোনো দরকার নেই। আমাদের কমিউনিস্টদের ঝড়ঝাপটা মোকাবিলা করা ও দুনিয়ার মুখোমুখি হওয়া উচিত; এই ঝড়ঝাপটা হচ্ছে গণসংগ্রামের প্রবল ঝড়ঝাপটা এবং এ দুনিয়া হচ্ছে গণসংগ্রামের মহান দুনিয়া। “সংগঠিত হোন” (২৯ নভেম্বর, ১৯৪৩)

*** কমিউনিস্টদের অগ্রণীর ভূমিকা ও আদর্শের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীতে কমিউনিস্টদের বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার, আদেশ পালন করার, শৃঙ্খলা মেনে চলার, রাজনৈতিক কাজের এবং অভ্যন্তরীণ ঐক্য সংহতির আর্দশ হয়ে উঠতে হবে। “জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান” (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** কমিউনিস্টের কোনো ক্রমেই নিজেকে সব সময় ঠিক বলে মনে করা বা উদ্ধত হওয়া উচিত নয়, এমন মনে করা উচিত নয় যে, নিজে সব কিছুতেই ভাল, অন্যরা কিছুতেই ভাল নয়; নিজেকে নিজের ছোট ঘরে বন্ধ করে রেখে আপন ঢাক আপনি বাজানো ও অন্যের উপরে মাতব্বরি করা কোনো মতেই উচিত নয়। “সেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকার প্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ” (২১ নভেম্বর, ১৯৪১)

*** কমিউনিস্টদের অবশ্যই পার্টি বহির্ভূত লোকদের মতামত কান পেতে শুনতে হবে, অন্যদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। অন্যরা যা বলেন, তা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত এবং অন্যদের সদ্গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত; অন্যরা ভুল বললেও তাদেরকে শেষ পর্যন্ত বলতে দেওয়া উচিত এবং পরে ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করা উচিত। ঐ

*** নিজেদের কাজে যারা ভুল করেছেন এমন লোকদের মধ্যে যারা অসংশোধনীয়, তাদের ছাড়া অন্য সকলের প্রতি কমিউনিস্টদের বুঝিয়ে বলার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত, সরিয়ে রাখার নয়, যাতে তারা নিজদের পরিবর্তিত করতে পারেন এবং পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুন যাত্রা শুরু করতে পারেন। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** যাঁরা পশ্চাৎপদ, তাঁদেরকে কমিউনিস্টদের তুচ্ছ করে দেখা কিংবা উপেক্ষা করা উচিত নয়, বরং তাদের নিকটতর হওয়া, তাদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বুঝিয়ে বলা এবং অগ্রসর হবার জন্য তাদেরকে প্রেরণা দেয়া উচিত। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

কেডার

*** আমাদের পার্টির ও রাষ্ট্রের রঙ যাতে বদল না হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে শুধু সঠিক লাইন ও নীতির প্রয়োজন, তাই নয়, বরং সর্বহার শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের কোটি কোটি উত্তরাধিকারীকে অবশ্যই লালন পালন ও প্রস্তুত করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের উত্তরাধিকারীদের লালন পালন করার সমস্যা, মূলত বলতে গেলে, এটা হচ্ছে, সর্বহারা শ্রেণীর প্রবীণ বিপ্লবীদের শুরু করা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এমন লোক থাকবেন কি না, ভবিষ্যতে আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবীদের হাতে অব্যাহত থাকবে কি না, আমাদের বংশধররা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্ভুল পথ বেয়ে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হতে পারবেন কি না, অর্থাৎ আমরা চীনে ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদের পুনঃআবির্ভাবকে সাফল্যের সঙ্গে ঠেকাতে পারবো কি না, তার সমস্যা। এক কথায়, এটা আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের ভাগ্য সম্পর্কিত জীবন মরণের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এটা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের প্রতি একশ' বছর, হাজার বছর, এমনকি দশ হাজার বছরের জন্য একটা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঘটিত পরিবর্তনের উপরে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী ভবিষ্যদ্বক্তারা চীনা পার্টির তৃতীয় বা চতুর্থ বংশধরদের উপর 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের আশা পোষণ করছে। আমাদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে সর্বনিম্ন সংস্থা পর্যন্ত, সর্বত্রই বিপ্লবী কার্যের উত্তরাধিকারীদের লালন পালন ও প্রস্তুত করার দিকে অনবরত মনোযোগ দিতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার জন্য কি কি শর্তের প্রয়োজন?

তাদের অবশ্যই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে হবে, কিন্তু ক্রুশ্চেভের মতো মার্কর্সবাদ-লেনিনবাদের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সংশোধনবাদী হলে চলবে না।

তাদের এমন বিপ্লবী হতে হবে, যারা মনেপ্রাণে চীনের ও বিশ্বের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সেবা করেন, কিন্তু তাঁদের ক্রুশ্চেভের মতো নিজের দেশের ভেতরে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত স্তরের স্বার্থের সেবা করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থের সেবা করা উচিত নয়। তাঁদের অবশ্যই বিপুল সংখ্যাধিক লোকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে সক্ষম এমন সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হতে হবে। কেবলমাত্র যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন, সেইসব লোকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেই চলবে না, বরং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, সেইসব লোকের সঙ্গে, এমনকি যারা পূর্বে তাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাস্তব কাজে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন, এমন সব লোকের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হতে নিপুণ হতে হবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভের মতো মতলববাজ ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি অবশ্যই বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, এই ধরনের খারাপ লোককে পার্টির ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বকে কুক্ষিগত করতে বাধা দিতে হবে।

তাঁদের অবশ্যই পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার অনুসরণে আদর্শ হতে হবে, ‘জনসাধারণের থেকে আসা এবং জনসাধারণের মধ্যে যাওয়ার’ নেতৃত্বের পদ্ধতিকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে এবং জনসাধারণের মতামত শুনতে নিপুণ হবার গণতান্ত্রিক রীতিকে আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভের মতো পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে লঙঘন করা, স্বেচ্ছাচারী হওয়া, কমরেডদের উপর আকস্মিক হামলা চালানো, যুক্তি না মানা অথবা ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরতন্ত্র চালু করা চলবে না।

তাঁদের অবশ্যই বিনয়ী ও সতর্ক হতে হবে, অহঙ্কার ও অসহিষ্ণুতার প্রতি সজাগ থাকতে হবে, আত্মসমালোচনার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হতে হবে এবং নিজেদের কাজের ভুল-ত্রুটি শুধরানোর জন্য সাহসী হতে হবে। কিন্তু কোনো মতেই ক্রুশ্চেভের মতো ভুলত্রুটিকে ঢেকে রাখা, সমস্ত কৃতিত্ব নিজেদের জন্য দাবি করা, সমস্ত ভুলত্রুটি অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের উত্তরাধিকারী গণসংগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিপ্লবের প্রবল ঝড় ও তরঙ্গে পরীক্ষিত হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। দীর্ঘকালীন গণসংগ্রামের মধ্যে কেডারদের যাচাই ও বিচার করা এবং উত্তরাধিকারীদের বাছাই ও লালন পালন করা উচিত। “ক্রুশ্চেভের মেকী কমিউনিজম ও পৃথিবীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে” থেকে উদ্‌ধৃত (১৪ জুলাই, ১৯৬৪)

*** আমাদের পার্টি সংগঠনগুলো অবশ্যই সারা দেশে সম্প্রসারিত হবে, অবশ্যই হাজার হাজার কেডারদের সচেতনভাবে তৈরি করে তুলতে হবে এবং কয়েকশ সর্বোত্তম জননেতার প্রয়োজন হবে। এই কেডার ও নেতারা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝেন, তারা রাজনীতিতে দূরদর্শী, কর্মে দক্ষ, আত্মবলিদানের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ, স্বাধীনভাবে সমস্যা সমাধানে সক্ষম, বাধা-বিপত্তিতে অবিচলিত এবং জাতি, শ্রেণী ও পার্টির জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মরত। পার্টি এইসব লোকের উপর নির্ভর করেই পার্টি সদস্য ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং এইসব লোক জনসাধারণকে যে দৃঢ় নেতৃত্ব দেন, তার উপর নির্ভর করেই শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌছে। এই ধরনের লোককে স্বার্থপরতা থেকে, ব্যক্তি বীরত্ব ও আত্মপ্রচারবাদ থেকে, কুঁড়েমি ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে এবং হামবড়াভাবে সংকীর্ণতাবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে; তাঁদের অবশ্যই নিঃস্বার্থ জাতীয় ও শ্রেণীর বীর হতে হবে। এ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, পার্টির কেডার ও পার্টির নেতাদের জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র ও রীতি। "কোটি কোটি জনসাধারণকে জাপানবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টে আনার জন্য সংগ্রাম" (৭ মে, ১৯৩৭)

*** রাজনৈতিক লাইন নির্ধারিত হয়ে গেলে, কেডারই হচ্ছে নির্ণায়ক উপাদান। তাই, পরিকল্পিতভাবে বিপুল সংখ্যক নতুন কেডারকে লালন করাই হলো আমাদের সংগ্রামী কর্তব্য। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** কমিউনিস্ট পার্টির কেডার নীতিতে, যে মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত, তা হচ্ছে কেডাররা পার্টির লাইন দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন কি না, পার্টির শৃঙ্খলা মানেন কি না, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে কি না, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম কি না এবং তারা সক্রিয় পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ কি না; এটাই হচ্ছে 'কেবল যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগের' লাইন। ঐ

*** যৌথ উৎপাদন শ্রমে কেডারদের যোগদানের ব্যবস্থাটা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। আমাদের পার্টির ও রাষ্ট্রের কেডাররা হচ্ছেন সাধারণ শ্রমজীবী, জনগণের মাথায় চড়ে বসা লাটসাহেব নন। যৌথ উৎপাদন শ্রমে যোগদান করে কেডাররা শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে সবচেয়ে ব্যাপক, নিত্য ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হচ্ছে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা আমলাতন্ত্রবাদকে অতিক্রম করতে এবং সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামিবাদকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। "ক্রুশ্চেভের মেকী কমিউনিজম ও পৃথিবীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে" থেকে উদ্‌ধৃত (১৪ জুলাই, ১৯৬৪)

*** অবশ্যই কেডার বিচারে নিপুণ হতে হবে। শুধুমাত্র কেডারদের জীবনের অল্প সময়ের অবস্থা অথবা একটা মাত্র কাজ দেখলেই হবে না, বরং তাঁদের সমস্ত ইতিহাস ও সমস্ত কাজের বিবেচনা করতে হবে, এটাই হচ্ছে কেডারদের বিচার করার প্রধান পদ্ধতি। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** অবশ্যই কেডারদের কাজে লাগাতে নিপুণ হতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিচালকদের দায়িত্ব প্রধানত দুটো ব্যাপার—অভিমত পেশ করা এবং কেডারদের কাজে লাগানো। সমস্ত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, আদেশ এবং নির্দেশ ইত্যাদি 'অভিমত পেশ করার আওতায় পড়ে। এই সমস্ত অভিমত বাস্তবায়িত করার জন্য অবশ্যই কেডারদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে, এটা 'কেডারদের কাজে লাগানোর আওতায় পড়ে।

অবশ্যই কেডারদের যত্ন নিতে নিপুণ হতে হবে। যত্ন নেবার পদ্ধতি হচ্ছে— প্রথম, তাঁদের পথনির্দেশ করা। এর অর্থ তাদের অবাধে কাজ করতে দেওয়া, যাতে করে তাঁরা সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন; একই সময়ে তাঁদের সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া, যাতে করে পার্টির রাজনৈতিক লাইনে পরিচালিত হয়ে তাঁরা নিজেদের সৃজনশীল উদ্যোগকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারেন। দ্বিতীয়, তাঁদের মান উন্নত করা। এর অর্থ, অধ্যয়ন করার সুযোগ দেওয়া, তাদের শিক্ষাদান করা, যাতে করে তারা তত্ত্বগত ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে উন্নত করতে পারেন। তৃতীয়, তাঁদের কাজকর্মের পরীক্ষা করে দেখা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার সারসংকলনে, তাদের সাফল্যকে সামনে এগিয়ে নিতে ও ভুলগুলোকে শুধরাতে তাদেরকে সাহায্য করা। পরীক্ষা ছাড়া কাজের ভার দেওয়া এবং শুধু মারাত্মক ভুল করা হলেই তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা কেডারদের প্রতি যত্ন নেয়ার পদ্ধতি নয়। চতুর্থ, যেসব কেডাররা ভুল করেছেন, সাধারণত তাঁদের প্রতি বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং তাদের ভুল শুধরাতে সাহায্য করতে হবে। গুরুতর ভুল করেও যারা নির্দেশ মানে না, কেবলমাত্র তাদের প্রতিই সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ধৈর্য এখানে অপরিহার্য; কোনো লোককে অবিবেচিতভাবে 'সুবিধাবাদের' লেবেল এঁটে দেওয়া অথবা অবিবেচিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়। পঞ্চম, তাদের অসুবিধায় সাহায্য করা। কেডাররা রোগ, জীবনযাত্রা বা পারিবারিক ও অন্যান্য কষ্টের ফলে অসুবিধায় পড়লে তাদের প্রতি যতটা সম্ভব

অবশ্যই মনোযোগের সঙ্গে যত্ন নিতে হবে। এগুলোই হচ্ছে কেডারদের যত্ন নেয়ার পদ্ধতি। ঐ

*** প্রকৃতই ঐক্যবদ্ধ ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত একটা নেতৃত্ব-মেরুদণ্ড কেবলমাত্র গণসংগ্রামের মধ্যে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে পারে— তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। অধিকাংশ অবস্থায় একটা মহান সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে, তার প্রাথমিক পর্যায়, মধ্য পর্যায় ও শেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব-মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকা উচিত নয় এবং তা থাকতেও পারে না; সংগ্রামের প্রবাহে যেসব সক্রিয় ব্যক্তিরা উৎরে আসেন, তাদের অবশ্যই অবিরামভাবে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে হবে এবং পূর্ববর্তী মেরুদণ্ডে যাঁরা তুলনাগতভাবে হীন অথবা অধঃপতিত, সেসব সদস্যদের বদলে তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। “নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা” (১ জুন, ১৯৪৩)

*** যদি আমাদের পার্টিতে ব্যাপক নতুন কেডার ও পুরনো কেডারদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা না থাকে, তাহলে আমাদের কার্য মাঝপথে গতিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই সমস্ত পুরনো কেডারদেরকে পরম উৎসাহের সঙ্গে নতুন কেডারদের স্বাগত জানাতে হবে, তাদের যত্ন নিতে হবে। সত্যি নতুন কেডারদের ত্রুটি আছে, বিপ্লবে তারা যোগ দিয়েছেন বেশি দিন হয়নি; তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরিহার্যভাবেই পুরনো সমাজের অস্বাস্থ্যকর মতাদর্শের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে এসেছেন, এটা ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিবাদী চিন্তাধারার অবশিষ্টাংশ। কিন্তু এই ত্রুটিগুলো শিক্ষা আর বিপ্লবের অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে দূর করা যেতে পারে। যেমন স্ট্যালিন বলেছেন, তাঁদের সদগুণ হচ্ছে— যা কিছু নতুন সেসব বিষয়ের প্রতি তাঁদের বোধশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তারা অত্যন্ত বেশি উদ্দীপ্ত ও সক্রিয়, কিন্তু কোনো কোনো পুরনো কেডারদের মধ্যে রয়েছে ঠিক এ গুণেরই অভাব। নতুন ও পুরনো কেডারদের পরস্পরকে সম্মান করা, পরস্পর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, অন্যের সদগুণ নিয়ে নিজের ত্রুটি অতিক্রম করা উচিত, যাতে করে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অভিন্ন কার্য সাধন করতে পারেন এবং সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁককে ঠেকাতে পারেন। “পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ” (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** শুধুমাত্র পার্টি কেডারদের নয় বরং অদলীয় কেডারদেরও যত্ন নিতে হবে। পার্টির বাইরে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই নিজের দৃষ্টির বাইরে তাদের রাখতে পারে না। প্রত্যেক কমিউনিস্টের

কর্তব্য হলো, অহমিকা থেকে নিজেকে মুক্ত করা, অদলীয় কেডারদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে নিপুণ হওয়া, তাদের আন্তরিক সাহায্য দেওয়া, তাঁদের প্রতি একটা ঐকান্তিক কমরেডসুলভ মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করা এবং তাদের সক্রিয়তাকে জাপানবিরোধী যুদ্ধের ও দেশ গঠনের মহান কার্যে নিয়োজিত করা। “জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান” (অক্টোবর, ১৯৩৮)

যুবক

*** পৃথিবী তোমাদের এবং আমাদেরও, কিন্তু অবশেষে তোমাদেরই। তোমরা যুবক, সজীব ও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, জীবনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, সকালবেলার আট-ন'টার সূর্যের মতো। তোমাদের উপরেই আশা রাখি।

পৃথিবী তোমাদেরই। চিনের ভবিষ্যতও তোমাদের। "মস্কোতে চীনা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানবিশিদের সাক্ষাতদানকালে প্রদত্ত ভাষণ" (১৭ নভেম্বর, ১৯৫৭)

*** সমস্ত যুবকদেরকে এটা বুঝতে দেওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের দেশ এখনও অত্যন্ত দরিদ্র এবং অল্প সময়ের মধ্যে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। একমাত্র যুবকদের এবং সমস্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও তাঁদের স্বহস্তের কাজই কয়েক দশকের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের আদর্শ জগতে পৌছার জন্য আমাদের পথ খুলে দিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতের এ আদর্শ জগতকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আমাদের কঠোর শ্রমের উপর নির্ভর করতে হবে। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** বেশ কিছু সংখ্যক যুবক তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে পুরনো ও নয়া চীনের তুলনা করতে নিপুণ নয়, সাম্রাজ্যবাদী ও কুওমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আমাদের জনগণকে যে কত কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, আর একটা সুষ্ঠু সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কত দীর্ঘকালের কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। অতএব, জনসাধারণের মধ্যে সজীব ও কার্যকরী রাজনৈতিক শিক্ষা অবিরামভাবে চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং যেসব বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে, তা তাদের কাছে সব সময়েই সত্যি সত্যি ব্যাখ্যা করতে হবে আর কি করে এ সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায়, সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ঐ

*** যুবকরাই হচ্ছে গোটা সমাজের সবচেয়ে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি। শিক্ষা গ্রহণে তারা সবচেয়ে বেশি আগ্রহশীল আর তাদের চিন্তাধারা

সবচেয়ে কম রক্ষণশীল, সমাজতান্ত্রিক যুগে এ কথাটা বিশেষরূপে সত্য। আমরা আশা করি, বিভিন্ন স্থানের পার্টি সংগঠনগুলো স্থানীয় যুব সংগঠনকে সাহায্য করবে, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করবে এবং কেমন করে যুবশক্তিকে বিশেষভাবে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়, এই প্রশ্নটিকে বিচার করার প্রতি মনোযোগ দেবে, তাদেরকে সাধারণ লোক হিসেবে দেখা কিংবা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অবশ্যই, বৃদ্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে যুবকদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন হিতকর কাজ করার পূর্বে যুবকদের যথাসম্ভব বৃদ্ধ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্মতি নিতে হবে। "চুংসান জেলার সিনপিং থানার নবম কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতির যুব অগ্রণীদল"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** একজন যুবক বিপ্লবী কি না, তা বিচার করতে কীরূপ মানদণ্ড ব্যবহার করা উচিত? কেমন করে পার্থক্য করা যায়? কেবল একটা মাত্র মানদণ্ড আছে, তা হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক-সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কি না এবং বাস্তবে তা করছে কি না। যদি এমন এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে সে একজন বিপ্লবী; অন্যথায় অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী। যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই সে বিপ্লবী; কিন্তু আগামী কাল যদি সে তাদের সঙ্গে না মিশে অথবা উল্টো সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী। "যুব আন্দোলনের দিশা" (৪ মে, ১৯৩৯)

*** জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়া অথবা জনসাধারণের স্বার্থের সেবা করতে এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে নিজেদের মনস্থির না করা পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শই আত্মমুখীবাদ ও ব্যক্তিতাবাদের ঝোঁক নিয়ে আসে, তখন তাদের চিন্তাধারা প্রায়ই হয়ে থাকে বাস্তববিমুখ এবং তাদের কার্যকলাপও হয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই চীনের ব্যাপক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যদিও অগ্রগামী ও সংযোগ সেতুর ভূমিকা নিতে পারে, তবুও এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে যেতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের জরুরী মুহূর্তে বিপ্লবী বাহিনী থেকে সরে পড়তে পারে এবং নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারে; আর কিছু সংখ্যক লোক বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবীদের এই ত্রুটি অতিক্রম করা যেতে পারে। "চীনা বিপ্লব ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি" (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

*** যুবলীগকে পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য সাধনে পার্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করে যাওয়া ছাড়াও যুবকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপযোগী নিজের কাজও করতে হবে। নয়া চীনকে তার যুবকদের জন্য ভাবতে হবে এবং যুবকদের উন্নতির জন্য যত্ন নিতে হবে। যুবকদের পড়াশোনা ও কাজ করতে হবে, কিন্তু তাঁদের বয়সটা তাদের শারীরিক পরিপুষ্টির বয়স। অতএব, তাদের কাজ ও পড়াশোনা এবং তাদের আমোদ প্রমোদ, খেলাধুলা ও বিশ্রাম উভয় দিকে অবশ্যই পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। "যুবলীগের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর সাক্ষাতদানকালে প্রদত্ত নির্দেশ" (৩০ জুন, ১৯৫৩)

নারী

*** চীনের পুরুষেরা সাধারণত তিন ধরনের ক্ষমতার ব্যবস্থার দ্বারা [রাজনৈতিক ক্ষমতা, গোষ্ঠীগত ক্ষমতা, ধর্মগত ক্ষমতা — সম্পাদকীয়] শাসিত... নারীদের পক্ষে উপরোক্ত এ তিন ধরনের ক্ষমতার দ্বারা শাসিত হওয়া ছাড়াও, তাঁরা পুরুষদের দ্বারা শাসিত (স্বামীত্বের ক্ষমতার দ্বারা)। এ চারটি ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা, গোষ্ঠীগত ক্ষমতা, ধর্মগত ক্ষমতা ও স্বামীত্বের ক্ষমতা সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে, আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি, যা চীনা জনগণকে বিশেষ করে, কৃষকদের বেঁধে রেখেছে। কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলে কেমন করে জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্ছেদ করেছেন, তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে সমস্ত ক্ষমতার মেরুদণ্ড। জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত ক্ষমতা, ধর্মগত ক্ষমতা ও স্বামীত্বের ক্ষমতা সবই টলায়মান হয়ে পড়ে।... স্বামীত্বের ক্ষমতা এ জিনিসটা গরীব কৃষকদের মধ্যে সর্বদাই দুর্বলতর, কারণ আর্থিক অবস্থার দরুন গরীব কৃষক-নারীরা ধনী শ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশি শ্রম করে পারেন না, তাই পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, এমনকি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁদেরই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির দেউলেপনা বেড়ে উঠতে থাকায় নারীদের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের মৌলিক শর্তে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছে। বর্তমান কৃষক আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা পল্লী নারী সমিতি সংগঠন করেছেন, নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে এবং স্বামীত্বের ক্ষমতা দিনের পর দিন থরথর করে কাঁপছে। এক কথায়, কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থা টলমল করছে। “হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্তের রিপোর্ট (মার্চ, ১৯২৭)

*** ঐক্যবদ্ধ হোন, উৎপাদন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করুন, নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করুন। “নয়া চীনের নারী” পত্রিকার জন্য অভিলেখন (২০ জুলাই, ১৯৪৯)

*** যুবক, মহিলা ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষা করুন, পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত যুবকদের সাহায্য করুন, জাপানবিরোধী যুদ্ধ ও সামাজিক প্রগতির জন্য হিতকর বিভিন্ন কাজে সমানাধিকারের ভিত্তিতে যোগদানের জন্য

যুবক ও মহিলাদের সংগঠিত হতে সাহায্য করুন, বিবাহের স্বাধীনতা ও নরনারীর সমানাধিকার বাস্তবায়িত করুন এবং যুবক ও শিশুদের হিতকর শিক্ষা দিন... "যুক্ত সরকার সম্পর্কে" (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৫)

*** সংগঠিতভাবে শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং উৎপাদন কাজে যোগদানের জন্য মহিলাদেরকে উৎসাহদান করাই হলো আমাদের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের সবচেয়ে মৌলিক কর্তব্য। "আমাদের অর্থনৈতিক নীতি" (২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৪)

*** একটা মহান সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য উৎপাদন কাজে যোগদান করতে ব্যাপক নারী-সাধারণকে জাগ্রত করার গুরুত্বটা খুবই বিরাট। উৎপাদনে পুরুষ ও নারীর সমান শ্রমের জন্য সমান বেতন দিতে হবে। কেবলমাত্র সমগ্র সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নারী পুরুষের মধ্যে সত্যিকারের সমানাধিকার হাসিল করা যায়। "নারীরা শ্রমফ্রন্টের পথে যাত্রা করেছেন" এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** কৃষি সমবায়করণের পর বহু সমবায় সমিতি শ্রমশক্তির স্বল্পতা বোধ করতে লাগলো, যারা আগে মাঠে কাজ করেন নি, সেই ব্যাপক নারী-সাধারণকে শ্রমফ্রন্টে যোগদানের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা প্রয়োজন।... চীনের নারীরা হচ্ছেন জনশক্তির একটা মহান উৎস। একটা মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার সংগ্রামে এই উৎসকে কাজে লাগাতে হবে। "উৎপাদনে যোগদানের জন্য নারীদের উদ্‌বুদ্ধ করে শ্রমশক্তির স্বল্পতার সমাধান হয়েছে"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

*** ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত কর্মক্ষম নারীদের সমান শ্রমের জন্য সমান বেতনের নীতির ভিত্তিতে শ্রমফ্রন্টে যোগদানের জন্য টেনে নিন, এই দাবিটা যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকরী করতে হবে। "কৃষি সমবায়করণ আন্দোলনে নারীদের মধ্যে কাজ চালানোর পরিকল্পনা সম্পর্কে সিংথাই জেলার গণতান্ত্রিক নারী সমিতি" এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

*** বর্তমান দুনিয়ায়, সমস্ত সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য ও শিল্পকলা নির্দিষ্ট শ্রেণীর অধিকারে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের অধিকারে। শিল্পকলার খাতিরেই শিল্পকলা, শ্রেণির ঊর্ধ্বে শিল্পকলা এবং রাজনীতির সঙ্গে সমান্তরাল অথবা পরস্পর স্বাধীন শিল্পকলার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। সর্বহারা শ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির সমগ্র বিপ্লবী কার্যের একটা অংশ, তারা হচ্ছে লেনিন যেমন বলেছেন, সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের 'দাঁতওয়ালা চাকা ও স্ক্রু'। "সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েন ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

*** বিপ্লবী সংস্কৃতি হচ্ছে, ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে বিপ্লবের বলিষ্ঠ অস্ত্র। বিপ্লবের পূর্বে তা হচ্ছে বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রস্তুতি; বিপ্লবের সময়ে তা হচ্ছে বিপ্লবের সাধারণ ফ্রন্টের মধ্যে একটা অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট। "নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" (জানুয়ারি, ১৯৪০)

*** আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে জনসাধারণের জন্য, প্রথমত শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্য, শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্যই এগুলো রচিত হয় এবং এগুলোকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যরাই ব্যবহার করেন। "সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনান ফোরামে প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

*** আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার কর্মীদের অবশ্যই এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে এবং নিজেদের অবস্থানকে পরিবর্তন করতে হবে, শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করার ও বাস্তব সংগ্রামের গভীরে যাবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়ন করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে হবে এবং এসে দাঁড়াতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পক্ষে, সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে। শুধুমাত্র এভাবেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্য সত্যিকারের সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণির সাহিত্য ও শিল্পকলা। ঐ

*** সাহিত্য ও শিল্পকলাকে ভালভাবে সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের একটা অঙ্গীভূত অংশ হিসেবে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করার এবং শত্রুকে আঘাত ও ধ্বংস করার শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা দরকার এবং

একমনে একপ্রাণে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে জনগণকে সাহায্য করা দরকার। ঐ

*** সাহিত্য ও শিল্পকলার সমালোচনার দুটি মানদণ্ড আছে— একটা রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটা শৈল্পিক মানদণ্ড ।...

রাজনৈতিক মানদণ্ড আছে, আবার শৈল্পিক মানদণ্ডও আছে, এ দুয়ের সম্পর্ক কি? রাজনীতি শিল্পকলার সমান নয়, সাধারণ বিশ্ব দৃষ্টিকোণও শিল্পকলা সৃষ্টির ও শিল্পকলা সমালোচনার পদ্ধতির সমান নয়। আমরা যেমন বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় রাজনৈতিক মানদণ্ডকে অস্বীকার করি, তেমনি বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় শৈল্পিক মানদণ্ডকেও অস্বীকার করি; বিভিন্ন শ্রেণিসমাজে বিভিন্ন শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মানদণ্ডও আছে। কিন্তু যে কোনো শ্রেণিসমাজের যে কোনো শ্রেণিই সর্বদা রাজনৈতিক মানদণ্ডকে প্রথম স্থান দিয়ে থাকে এবং শৈল্পিক মানদণ্ডকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে থাকে।... আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একত্ব, বিষয়বস্তু ও রূপের একত্ব, বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্পরূপের একত্ব। শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শৈল্পিক গুণের অভাবে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অতএব, আমরা যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে ভুল শিল্পকর্মের বিরোধিতা করি, তেমনি তথাকথিত 'প্রচারপত্র-স্লোগান রীতির' ঝোঁক, যা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভুল কিন্তু শিল্পকর্মে শক্তিহীন, তারও বিরোধিতা করি। আমাদের অবশ্যই সাহিত্য ও শিল্পকলার সমস্যায় দুই ফ্রন্টের সংগ্রাম চালাতে হবে। ঐ

*** 'শত ফুল ফুটুক ও মতবাদের শত স্কুল প্রতিযোগিতা করুক'— এ নীতি হচ্ছে, শিল্পকলার বিকাশ ও বিজ্ঞানের প্রগতির প্রেরণাদানের নীতি এবং আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনের প্রেরণাদানের নীতি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও শৈলী স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদের স্কুল স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আমরা মনে করি, একটা বিশেষ শৈলী বা মতবাদের স্কুল চাপিয়ে দেয়ার এবং অন্য শৈলী বা মতবাদের স্কুল নিষেধ করার জন্য যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল বা নির্ভুলের সমস্যা সমাধান করতে হবে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের

মাধ্যমে, সরল পদ্ধতি দিয়ে তাদের সমাধান করা চলবে না। “জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে” (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

*** সংস্কৃতিবিহীন সৈন্যবাহিনী হচ্ছে ভোঁতাবুদ্ধির সৈন্যবাহিনী, আর ভোঁতাবুদ্ধির সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। “সাংস্কৃতিক কর্মে যুক্তফ্রন্ট” (৩০ অক্টোবর, ১৯৪৪)

অধ্যয়ন

*** অনগ্রসর কৃষিপ্রধান চীনকে একটি অগ্রসর শিল্পায়ত্ত চীনে পরিবর্তিত করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কঠোর কাজের সম্মুখীন হতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতাও মোটেই যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই তাই শিক্ষা গ্রহণে নিপুণ হতে হবে। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

*** অবস্থা নিরন্তরই পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই নতুন অবস্থার সংগে নিজেদের চিন্তাধারাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য অধ্যয়ন করতে হবে। এমনকি মার্কসবাদ সম্বন্ধে যারা অপেক্ষাকৃত বেশি জানেন এবং যারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে সর্বহারা শ্রেণির স্বপক্ষে দাঁড়ান, তাঁদেরও আরো অধ্যয়ন করতে হবে, যা নতুন তা গ্রহণ করতে হবে এবং যা নতুন তা গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন সমস্যাকে পর্যালোচনা করতে হবে। "প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ মার্চ , ১৯৫৭)

*** আমরা যা জানি, তা শিখে নিতে পারি। আমরা যে শুধু পুরাতন দুনিয়া ধ্বংস করতে নিপুণ, তাই নয় বরং নতুন দুনিয়া গঠন করতেও নিপুণ। "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ মার্চ, ১৯৪৯)

*** শিক্ষা গ্রহণে দুরকমের মনোভাব রয়েছে। একটা হলো গোঁড়ামিবাদের মনোভাব, আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী হোক বা না হোক, সব কিছুকেই এক সংগে বহন করে নিয়ে আসা। এ ধরনের মনোভাব ভালো নয়। অন্যটা হচ্ছে শিক্ষার সময় মাথা খাটিয়ে ভেবে আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী জিনিস শিখে নেওয়া, অর্থাৎ যেসব অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে হিতকর সেগুলো গ্রহণ করা; এই ধরনের মনোভাবেরই আমাদের দরকার। "জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

*** মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের তত্ত্ব সর্বত্রই প্রযোজ্য। তবে একে বেদবাক্য বলে মনে করা উচিত নয়, বরং কার্যকলাপের দিশারী বলে মনে করা উচিত। শুধু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলো পদ বা শব্দসমষ্টি শেখা উচিত নয়, বরং তাকে বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবে শেখা উচিত। ব্যাপক বাস্তব জীবন ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে গবেষণা করার মাধ্যমে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন, তা উপলদ্ধি করা উচিত, শুধু তাই নয়, বরং সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিকেও শেখা উচিত। "জাতীয় যুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর , ১৯৩৮)

*** যদি একটি নির্ভুল তত্ত্ব থাকে, কিন্তু যদি সেটাকে শুধু বকবককই করা হয়, সুউচ্চ মন্দির শীর্ষে রাখা হয় এবং কাজে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটি যত ভালই হোক না কেন, তার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। অনুশীলন সম্পর্কে, (জুলাই ১৯৩৭)

*** মার্কসবাদী তত্ত্বকে গভীরভাবে আয়ত্ত করা ও তা প্রয়োগ করা উচিত, গভীরভাবে আয়ত্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা প্রয়োগ করা। যদি আপনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করে একটি বা দুটি বাস্তব সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাহলে আপনি প্রশংসার যোগ্য এবং আপনি কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে করা যায়। যত বেশি, ব্যাপক ও গভীরভাবে আপনি তা করবেন, আপনার সাফল্য ততই বৃহত্তর হয়ে উঠবে। পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ, (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীনা বিপ্লবের অনুশীলন কেমন করে পরস্পর সংযুক্ত? সাধারণ ভাষায় বলা যায়, "নিশানায় শর নিক্ষেপ"। "শর" হচ্ছে তীর, "নিশানা" হচ্ছে লক্ষ্য। লক্ষ্যের প্রতি তীর ছুড়তে হবে। তীর ও লক্ষ্যের সম্পর্ক যেমনি ঠিক তেমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও চীনা বিপ্লবের সম্পর্ক। কোনো কোনো কমরেড কিন্তু "লক্ষ্যহীনভাবেই তীর ছোঁড়েন", এলোপাতাড়ি তীর ছোঁড়েন, এ ধরনের লোক সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন। পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ, (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** কাজে যারা অভিজ্ঞ, তাঁদের তত্ত্বক্ষেত্রে অধ্যয়ন করতে হবে এবং মনোযোগের সংগে বই পড়তে হবে, শুধুমাত্র তা হলেই তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সুব্যবস্থিত করতে ও তার সারসংক্ষেপ করতে সক্ষম হবেন এবং তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবেন, শুধুমাত্র তখনই তাঁরা তাঁদের আংশিক অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন সত্য বলে ভুল করবেন না এবং অভিজ্ঞতাবাদের ভুল করবেন না। পার্টির রীতির শুদ্ধিকরণ, (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)

*** বই পড়া হচ্ছে শিক্ষা করা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা করা, আর এটাই হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধ শিক্ষা করা—এটাই আমাদের প্রধান পদ্ধতি। যার স্কুলে যাবার সুযোগ হয়নি, সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, এটাই হচ্ছে যুদ্ধের মধ্যে শেখা। বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের

কাজ, এটা প্রায়শই প্রথমে শেখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ করেই শেখা, কাজ করার মানেই শিক্ষা করা। চীনা বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৬

*** "সাধারণ জনগণ" ও সৈন্যের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, কিন্তু এটা মহাপ্রাচীর নয়, এই ব্যবধানটা দ্রুত দূর করা যায়, আর এ দূর করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লব করা ও যুদ্ধ করা। যখন আমরা বলি, শিক্ষা করা ও প্রয়োগ করা সহজ নয়, তখন এর অর্থ যে, সম্পূর্ণরূপে শিখে নেওয়া ও দক্ষতার সংগে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি "সাধারণ জনগণ" দ্রুত সৈন্যে পরিবর্তিত হতে পারেন, তখন এর অর্থ যে, প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়। এ দুটি বিষয়কে একত্রে রাখতে গিয়ে আমরা একটা চীনা পুরনো প্রবাদ বাক্য উল্লেখ করতে পারি — কার্য সাধনে যারা দৃঢ়-সংকল্প, তাঁদের পক্ষে দুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।" প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়, নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র দৃঢ়-সংকল্পের প্রয়োজন এবং নিপুণভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। চীনা বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি সমস্যা, ডিসেম্বর, ১৯৩৬

*** সকল বিজ্ঞ লোকের (তাঁরা যে কেউই হোন না কেন) কাছ থেকেই আমাদের অবশ্য অর্থনৈতিক কাজ শিখতে হবে। আমাদের শিক্ষক হিসেবে তাঁদেরকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে, শ্রদ্ধার ও সততার সংগে শিখতে হবে। অজানার অর্থ হচ্ছে না জানা, না জেনে জানার ভান করা উচিত নয়। "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" ৩০ জুন, ১৯৪৯

*** জ্ঞানের সমস্যা হচ্ছে বিজ্ঞানের সমস্যা, বিন্দুমাত্রও কপটতা কিংবা অহমিকা এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; নিশ্চিতরূপে যা দরকার তা হচ্ছে ঠিক এর উল্টো_ সততা ও বিনয়ের মনোভাব। "অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

*** অধ্যয়নের শত্রু হচ্ছে আত্মসন্তোষ, প্রকৃতই কিছু শিখতে হলে, অবশ্যই নিজদের আত্মতুষ্টি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিজদের প্রতি "শিক্ষা গ্রহণে তৃপ্তিহীন থাকা" এবং অন্যদের প্রতি "শিক্ষাদানে অক্লান্ত হওয়া"_ এই ধরনের মনোভাব আমাদের থাকা উচিত। "জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থান" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

*** মার্কসবাদ শিক্ষা করতে গেলে, শুধুমাত্র পুস্তক থেকেই নয়, বরং প্রধানত: শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, কাজের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে এবং শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংস্পর্শের মধ্যে দিয়েই তাকে সত্যি সত্যি আয়ত্ত্ব করা সম্ভব। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যদি কয়েকটা মার্কসবাদী বই

পড়েন এবং শ্রমিক- কৃষকসাধারণের সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে ও নিজেদের কাজের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা জানতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই অর্জন করবো একটা অভিন্ন ভাষা, শুধুমাত্র দেশপ্রেমের ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা নয়, বরং সম্ভবত কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টিকোণক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষাও। এমনি করলে আমাদের সকলের কাজ নিশ্চিতরূপেই আরো অনেক বেশি ভালো হবে।
"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ মার্চ, ১৯৫৭)